হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

পথের আলো

বৈশাখ * ১৪২১

একোনপঞ্চাশৎ বর্ষ * প্রথম সংখ্যা

বন্দে বন্দারুমন্দারং বৃন্দারকবিবন্দিতম্।
স্মেরাস্যং সুন্দরং সৌম্যং সীতারামং সনাতনম্॥
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংস-কুঞ্জর-কেশরী।
কালিন্দী-কলকল্লোল-কোলাহল-কুতূহলী॥

উপদেষ্টা মণ্ডলী
সংঘাচার্য ডঃ নির্মল কুমার পাণিগ্রাহী
সংঘ-সর্বাধীশ কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ
সাহিত্যিক শ্রী সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

যুগ্ম-সম্পাদক
অধ্যাপক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য
কিঙ্কর সামানন্দ

সহ-সম্পাদক
শ্রী সমীরণ মুখোপাধ্যায়

সঞ্চালক, বার্তা বিভাগ
কিঙ্কর প্রণবানন্দ

সঞ্চালক, উপায়ন বিভাগ
শ্রী তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়

সঞ্চালক, শ্রীকোষ বিভাগ
শ্রী দীপক দেবনাথ

কর্মাধ্যক্ষ
শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহামিলন মঠ
৭/৭, পি.ডব্লিউ.ডি. রোড, কোলকাতা - ১০৮
দূরভাষ ঃ ২৫৭৭ ৫১৭৯/২৮৭৩ ২৪৩৮
website : www.patheralo.org

সূ চী প ত্র

বারো টাকা মাত্র

সম্পাদকীয় ৫৬২

শ্রীশ্রীচণ্ডী *
শ্রীশ্রীঠাকুর ৫৬৩

পণ্ডিত গৌরীদাসের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত *
কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ ৫৬৫

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ *
কিঙ্করী যোগমায়া দেবী ৫৬৭

সাঁইবনা শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দির *
শ্রী শম্ভু দেবনাথ ৫৬৯

আঁধার পেরিয়ে আলোর প্রভাতে *
শ্রী জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ৫৭৩

সংঘ সমাচার
শ্রীনামপ্রচার তথা ধর্মপ্রচার...সর্বাধীশজী *
শ্রী সুব্রত রায়চৌধুরী ৫৭৭

কোটার যজ্ঞ ও যজ্ঞকর্তা—দুইই অবিস্মরণীয়
কিংকর শঙ্করানন্দজী ৫৮৬

রাজধানী দিল্লীর বুকে...অনাড়ম্বর জন্মোৎসব *
কিংকর দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী ৫৮৭

নীলাচলে 'নাম দিগে যা' উৎসব ২০১৪ * ৫৮৮

বর্ষসূচী - ১৪২০ ৫৯০

প্রতি সংখ্যা ঃ বারো টাকা মাত্র *** বার্ষিক সডাক মূল্য ঃ একশো পঞ্চাশ টাকা মাত্র

সম্পাদকীয়

শ্রীওঙ্কারনাথদেব নির্দেশিত যে সাধনপথ তা বহুধা বিস্তৃত। অধিকারী ভেদে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সাধন নির্দেশ করেছেন। তবে সর্ব সাধারণের জন্য তিনি পথ বলেছেন নাম ও প্রণাম। তাঁর বাণী হল—কেবল প্রণাম করতে পারলে আর কিছু করতে হয় না। শাস্ত্রও বলেছেন, প্রণামের দ্বারা ভগবানকে পাওয়া যায়। পাণ্ডব গীতায় বলা হয়েছে, দশাশ্বমেধ যজ্ঞ করলেও আবার জন্ম হয়, কিন্তু যিনি প্রণাম করেন তাঁকে আর জন্মাতে হয় না! শুধু প্রণাম করলেই মানুষ পবিত্র হয়। এমনকি কেউ যদি লোক দেখিয়ে প্রণাম করে তাহলেও তার পাপ তখনই নষ্ট হয়ে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুর কায়িক, বাচিক ও মানস ভেদে তিনরকম প্রণামের কথা বলেছেন, তার মধ্যে কায়িক প্রণাম আবার তিন রকম—উত্তম প্রণাম সাষ্টাঙ্গ, মধ্যম হল পঞ্চাঙ্গ ও অধম হল করজোড়ে নমস্কার। এখন আমরা যে এক হাতে স্পর্শ করে প্রণাম করি তাও অসিদ্ধ শুধু নয়, এই ধারায় প্রণাম যাঁরা করেন তাঁদের পুণ্য চলে যায় এবং যাঁকে এভাবে প্রণাম করা হয় তাঁরও অনিষ্ট ঘটে। এছাড়া আজকাল প্রায়ই দেখা যায় মন্দিরের কাছে আমরা একটি হাত বা একটি আঙুল কোনক্রমে মাথায় ছোঁয়াই—ব্যস্ প্রণাম হয়ে গেল! আসলে কিছুই হল না।

প্রণামের নিয়ম হল ডান হাতে ডান পা এবং বাঁ হাতে বাঁ পা স্পর্শ করেই স্পর্শ প্রণাম করা উচিৎ। অন্যথা স্পর্শ না করে প্রণাম করাও ভাল। এমনকি শুধু মৌখিক নমস্কার বা প্রণাম বললেও প্রণাম করা হয়। মনু বলেছেন—প্রণামকারীর আয়ু, বিদ্যা, যশ ও বল—এই চারটি বৃদ্ধি হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন 'নমঃ' পদটি পূর্ণ-আনন্দলাভের একমাত্র কারণ। তিনি নিত্য প্রণাম করতে তো বলতেনই, এ ছাড়া চাতুর্মাস্যে নিয়ম করে সংখ্যা রেখে প্রণাম করার নির্দেশও দিতেন।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথদেব কথিত অভিনব প্রণববাদ অনুধাবন করলে বোঝা যায় তাঁর মতটি চরম অদ্বৈতবাদ। আমরা লক্ষ্য করি শ্রীশ্রীঠাকুর প্রণামের পথ বলেছেন, সাধারণভাবে মনে হতে পারে 'প্রণাম' এ তো প্রণতঃ, প্রণাম ও প্রণম্য—এই তিনটি ভেদ রয়েছে, তাহলে তত্ত্বতঃ 'প্রণাম' এর পথে কি করে অদ্বৈত স্থিতি লাভ হওয়া সম্ভব? শ্রীশ্রীঠাকুর এর মৌলিক উত্তর দিয়েছেন 'ক্ষেপার ঝুলি' গ্রন্থে—'মকারের দ্বারা স্বতন্ত্র বুঝায়, ন কার তা নিষেধ করে। তজ্জন্য নমঃ শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রতা অপনীত হয়।" এবং আরও বলেছেন যে, ''প্রাচীনগণ নমস্কার প্রহবতা লক্ষণ বলেন। প্রহবতার অর্থ সৎ চিৎ আনন্দ লক্ষণ শিব হ'তে মায়ার দ্বারা ভেদ; স্বরূপতঃ নয়। ভাসমান জীবের নমস্কারের দ্বারা তাঁহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন, সেই সম্বন্ধ অভেদ।"

কোন দার্শনিকই এর আগে নমস্কারের এই অদ্বৈত রূপ উন্মোচনে সমর্থ হয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই। সুতরাং শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও সাধন পথের আরও একটি মৌলিক উন্মোচন মানবজাতিকে সমৃদ্ধ করল, সম্পূর্ণ করল—একথা অসংশয়ে বলা যায়।

পরিশেষে নিবেদন—এই সংখ্যা থেকে 'পথের আলো'র সঙ্গে একই মলাটে প্রকাশিত হবেন 'জয়গুরু'। প্রভুর এই লীলাকেও আমরা প্রণাম জানাই—'যাদৃশোঽসি মহাদেব তাদৃশায় নমো নমঃ।'

শ্রীশ্রীচণ্ডী

প্রণব-প্রেমামৃত ভাষ্য

শ্রীশ্রীঠাকুর

[শ্রীশ্রীঠাকুর রচিত চণ্ডী থেকে শ্রীশ্রীপ্রণব প্রেমামৃত ভাষ্যের শ্রীহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপিটি চতুর্থ অধ্যায় থেকে আমাদের হস্তগত হয়েছে। তাই এখান থেকেই পাঠকের কাছে গ্রন্থটি নিবেদন করা হল। চণ্ডীর এক থেকে তৃতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুর লিখিত ও শ্রীগুরু প্রকাশন কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ অনেকদিন পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। মহামিলন মঠে পাওয়া যাচ্ছে। —সম্পাদক]

(পূর্বানুবৃত্তি)

সপ্তম অধ্যায়, চণ্ডমুণ্ডবধ

ঋষিরুবাচ ।। ২৫

তাবানীতৌ ততো দৃষ্ট্বা চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ।
উবাচ কালীং কল্যাণী ললিতং চণ্ডিকা বচঃ॥ ২৬

অন্বয় ঃ ঋষিঃ উবাচ, ততঃ তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ আনীতৌ দৃষ্ট্বা কল্যাণী চণ্ডিকা কালীং ললিতং বচঃ উবাচ॥ ২৫-২৬

বঙ্গানুবাদ ঃ ঋষি বলিলেন—অনন্তর সেই চণ্ডমুণ্ড মহাসুরদ্বয় আনীত দেখিয়া কল্যাণী কৌশিকী কালীকে এই মধুর বাক্য বলিলেন॥ ২৫-২৬

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ততঃ অনন্তরং তৌ চণ্ডমুণ্ডৌ মহাসুরৌ আনীতৌ দৃষ্ট্বা কল্যাণী শুভকরী চণ্ডিকা কৌশিকী কালীং ললাটভবাং ললিতং মধুরং বচঃ বাক্যং উবাচ জগাদ।

যস্মাচ্চণ্ডঞ্চ মুণ্ডঞ্চ গৃহীত্বা ত্বমুপাগতা।
চামুণ্ডেতি ততো লোকে খ্যাতা দেবি ভবিষ্যসি॥ ২৭

অন্বয় ঃ হে দেবি ত্বং যস্মাৎ চণ্ডং মুণ্ডং চ গৃহীত্বা উপাগতা ততঃ লোকে চামুণ্ডা ইতি খ্যাতা ভবিষ্যসি॥ ২৭

বঙ্গানুবাদ ঃ হে দেবি! যেহেতু তুমি চণ্ড ও মুণ্ডকে গ্রহণ করিয়া আমার নিকট আগমন করিয়াছ, সেইজন্য তুমি জগতে চামুণ্ডা নামে খ্যাতা হইবে॥ ২৭

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ হে দেবি ত্বং যস্মাৎ হেতোঃ চণ্ডং মুণ্ডং চ গৃহীত্বা উপাগতা মৎসমীপমাগতা ততঃ হেতোঃ লোকে জগতি চামুণ্ডা ইতি খ্যাতা বিশ্রুতা ভবিষ্যসি। চণ্ডমুণ্ডৌ বিদ্যেতে অস্যাঃ চামুণ্ডা। কৌষিকী সিদ্ধিঃ অত্র চণ্ডমুণ্ডমিতি পূর্ববৎ লক্ষণয়া বা॥

শ্রীমার্কণ্ডেয়পুরাণের মধ্যগত সাবর্ণিমনুর অধিকারসময়ে দেবীমাহাত্ম্যে চণ্ডমুণ্ডবধ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

রক্তবীজবধ

ঋষিরুবাচ ॥ ১

চণ্ডে চ নিহতে দৈত্যে মুণ্ডে চ বিনিপাতিতে।
বহুলেষু চ সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষ্বসুরেশ্বরঃ॥ ২
ততঃ কোপপরাধীনচেতাঃ শুম্ভঃ প্রতাপবান্।
উদ্‌যোগং সর্ব্বসৈন্যানাং দৈত্যানামাদিদেশে হ॥ ৩

অন্বয় ঃ ঋষিঃ উবাচ, দৈত্যে চণ্ডে চ নিহতে চ মুণ্ডে বিনিপাতিতে সতি চ বহুলেষু সৈন্যেষু ক্ষয়িতেষু ততঃ অসুরেশ্বরঃ প্রতাপবান্ শুম্ভঃ কোপপরাধীনচেতাঃ দৈত্যানাং সর্ব্ব সৈন্যানাং উদ্‌যোগং আদিদেশ হ॥ ১-৩

বঙ্গানুবাদ ঃ ঋষি বলিলেন—দেবীর দ্বারা চণ্ড মুণ্ড নিহত ও বহুল সৈন্য ক্ষয় হইলে পর অসুরেশ্বর অতিতেজোযুক্ত শুম্ভ ক্রোধপরবশচিত্ত হইয়া সমস্ত দৈত্যসৈন্যকে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ করিতে আজ্ঞা করিলেন॥ ১-৩

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ চণ্ডে নিহতে সতি মুণ্ডে চ দৈত্যে দানবে বিনিপাতিতে সতি বহুলেষু ভূরিতরেষু সৈন্যেষু বলেষু ক্ষয়িতেষু কৃতক্ষয়েষু সৎসু ততঃ অনন্তরং অসুরেশ্বরঃ দৈত্যপতিং প্রতাপবান্ অতিতেজোযুক্তঃ কোপপরাধীনচেতাঃ ক্রোধপরবশচিত্তঃ সন্ দৈত্যানাং অসুরাণাং সর্ব্ব সৈন্যানাং সর্ব্বানি চ তানি সৈন্যানি চেতি নিঃশেষান্দ্রবলানাংঃ; যদ্বা সর্ব্বানি নিঃশেষাণি সৈন্যানি যেষাং দৈত্যানাম্ উদ্‌যোগং যুদ্ধার্থং সমারম্ভম্ আদিদেশ আজ্ঞপ্তবান্ হ ইতি সুরথ সম্বোধনে পাদপূরণে বা।।

অদ্য সর্ব্ববলৈর্দৈত্যাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ।
কম্বুনাং চতুরশীতির্নির্যান্তু স্ববলৈর্বৃতাঃ॥ ৪

অন্বয় ঃ অদ্য সর্ব্ব বলৈঃ বৃতাঃ ষড়শীতিঃ উদায়ুধাঃ কম্বুনাং চতুরশীতিঃ দৈত্যাঃ স্ববলৈঃ বৃতাঃ নির্যান্তু॥ ৪

বঙ্গানুবাদ ঃ অদ্য সমস্ত সৈন্যসহ ছিয়াশীজন উদায়ুধ সংজ্ঞক দৈত্য ও চুরাশি জন কম্বুবংশোদ্ভব দৈত্যগণ স্ব স্ব সৈন্য পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হউক॥ ৪

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ অদ্য অস্মিনহনি সর্ব্ববলৈঃ সমস্ত সৈন্যৈঃ বৃতাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধাঃ ষড়শীতিরুদায়ুধগণঃ চতুরশীতিঃ কম্বূনাং চতুরশীতি কম্বুগণঃ কম্বূসংজ্ঞক দৈত্যকুলোৎপন্নানাং তদ্দেশোদ্ভবানাং বা মধ্যে চতুরশীতি সংখ্যকাঃ স্ববলৈঃ স্বসৈন্যৈঃ বৃতা পরিবৃতাঃ নির্যান্তু নির্গচ্ছন্তু।

কোটিবীর্য্যাণি পঞ্চাশদসুরাণাং কুলানি বৈ।
শতং কুলানি ধৌম্রাণাং নির্গচ্ছন্তু মমাজ্ঞয়া॥ ৫

অন্বয় ঃ কোটিবীর্য্যাণি অসুরাণঅং পঞ্চাশৎ কুলানি ধূম্রাণাং শতং কুলানি মমাজ্ঞয়া নির্গচ্ছন্তু॥ ৫

বঙ্গানুবাদ ঃ কোটিবীর্য্যসংজ্ঞক পঞ্চাশজন অুসরগণ ধূম্রবংশোদ্ভব একশত অসুরকুল আমার আজ্ঞায় নির্গত হউক॥ ৫

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ কোটি বীর্য্যাণি কোটি বীর্য্যসংজ্ঞকারসুরকুলোদ্ভবানি অসুরাণাং পঞ্চাশৎ কুলানি গণাঃ ধৌম্রাণাং ধূম্রবংশোদ্ভবানাং শতং কুলানি গণাঃ মম আজ্ঞয়া আদেশেন নির্গচ্ছন্তু নির্যান্তু।

কালকা দৌর্হৃতা (দা) মৌর্য্যাঃ কালকেয়াস্তথাসুরাঃ।
যুদ্ধায় সজ্জা নির্যান্তু আজ্ঞয়া ত্বরিতা মম॥ ৬

অন্বয় ঃ কালকা দৌর্হৃতাঃ মৌর্য্যা তথা কালকেয়াঃ অসুরাঃ সজ্জা (সন্তঃ) মম আজ্ঞয়া যুদ্ধায় ত্বরিতা নির্যান্তু॥ ৬

বঙ্গানুবাদ ঃ কালক,দৌর্হৃত, মৌর্য্য ও কালকেয় অসুরগণ সজ্জিত হইয়া আমার আজ্ঞায় যুদ্ধার্থ শীঘ্র বহির্গত হউক॥ ৬

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ কালকাঃ কালকা সংজ্ঞা স্তদভিধাঃ দৌর্হৃতাঃ দুর্হৃতনামাসুরবংশজা মৌর্য্যাঃ মুরবংশজাঃ কালকেয়াঃ কালকানাম্নী কশ্যপপত্নী তদপত্যানি, এতে চত্বারোগণাঃ সজ্জা গৃহীতসন্নাহাঃ সন্তঃ মম আজ্ঞয়া আদেশেন যুদ্ধায় যুদ্ধার্থং ত্বরিতা সঞ্জাতত্বরা নির্যান্তু।

ইত্যাজ্ঞপ্যাসুরপতিঃ শুম্ভো ভৈরবশাসনঃ।
নির্জগাম মহসৈন্যসহস্রৈর্বহুভির্বৃতঃ॥ ৭

অন্বয় ঃ ভৈরবশাসনঃ অসুরপতিঃ শুম্ভঃ ইতি আজ্ঞাপ্য বহুভিঃ মহাসৈন্য সহস্রৈঃ বৃতঃ নির্জগাম॥ ৭

বঙ্গানুবাদ ঃ ভীষণশাসন অসুররাজ শুম্ভ এইরূপ আদেশ করত বহু সহস্র মহাসৈন্য পরিবৃত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন॥৭

প্রণব-প্রেমামৃত ঃ ভৈরবশাসনঃ ভীষণশাসনঃ, ভৈরব শাসনং যস্য অসুরপতিঃ দৈত্যরাজঃ শুম্ভঃ ইতি এবং আজ্ঞাপ্য আদিশ্য বহুভিঃ বহুলৈঃ মহাসৈন্যসহস্রৈঃ মহাবলসহস্রৈঃ বৃতঃ পরিবৃতঃ সন্ নির্জগাম যযুঃ।

ক্রমশঃ

গুরুদেবের কৃপা ধন্যা

শ্রীমতী মিঠু চট্টোপাধ্যায়

খ্যাতনামা কীর্ত্তনীয়া

ঃ যোগাযোগ ঃ

উপেন ব্যানার্জী লেন, সাতঘাট
গোন্দলপাড়া, চন্দননগর, হুগলি
পিন- ৭১২১৩৭

ঃ দূরভাষ ঃ

(০৩৩) ২৬৮৩-২৯৪৭
৯৮৩১৫৮৪৭৯৩

পণ্ডিত গৌরীদাসের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজ

কলিযুগ পাবন প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলাপরিকর গৌরীদাস পণ্ডিত শ্রীশ্রীনিত্যানন্দশাখার অন্তর্গত, পূর্বলীলায় সুবলসখা, দ্বাদশ গোপালের অন্যতম। পূর্বনিবাস নবদ্বীপের নিকটবর্তী নদীয়ার শালিগ্রাম পল্লী, পিতার নাম কাসারী মিশ্র, মাতার নাম কমলাদেবী, বাৎস গোত্রীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ, জন্মকাল ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দ, শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবের কিছু পূর্বে।

পণ্ডিত গৌরীদাসের সঙ্গে নিমাই পণ্ডিতের পরিচয় ঘটে বাল্যকালেই। পরবর্তীকালে এই পরিচয় নিবিড় প্রেমে পর্য্যবসিত হয়। কালনার একটি ঘটনা বিখ্যাত হয়ে আছে। পরিব্রাজনকালে পণ্ডিত গৌরীদাস অম্বিকা কালনায় এসে ভাগীরথী তীরে একটি ভজন কুটির নির্মাণ করে, সেইখানেই জপধ্যানে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। এদিকে সন্ন্যাস গ্রহণের পর নীলাচল যাত্রার পূর্বে এই সমাচার জ্ঞাত হয়ে গৌরাঙ্গপ্রভু শান্তিপুর থেকে অদ্বৈতাচার্য্য ও নিত্যানন্দ প্রভুসহ নৌপথে নিজেরাই নৌকার বৈঠা বেয়ে কালনার গৌরীদাসের ভজনকুটিরে সমুপস্থিত হন। আনুমানিক ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দে বহুদিন পরে অকস্মাৎ প্রভুকে এত নিকটে পেয়ে গৌরীদাস আনন্দে আত্মহারা হন। যথাসাধ্য সেবাদির পর প্রভুকে যাতে চিরতরে ভজনকুটিরে রাখতে পারেন তার জন্য তিনি খুবই কাকুতি-মিনতি করতে থাকেন। তদুত্তরে দয়ালপ্রভু স্থানীয় একটি নিম্ববৃক্ষ হতে শ্রীনিত্যানন্দ ও তাঁর নিজমূর্তি নির্মাণ করিয়ে গৌরীদাসকে দান করেন। গৌরীদাস সেই দুই প্রভুর দারুময় মূর্তি সম্বল করে সাধন ভজন ও সেবা পূজায় নিমগ্ন হন। এই বিষয়ে কৃষ্ণদাসজীর দুটি পদ উল্লেখযোগ্য।

তোমরা দুই ভাই থাক মোর
এই ঠাঁই তবে সবে হবে পরিত্রাণ
পুনঃ নিবেদন করি না ছাড়িও গৌরহরি,
তবে জানি পণ্ডিত পাবন॥
প্রভু কহে গৌরীদাস ছাড়হ এমন আস
প্রতিমূর্তি সেবা করি দেখ
তাহাতে আছয়ে আমি নিশ্চয়ই জানিও
তুমি সত্যমেবে এইবাক্য রাখ॥

জনপ্রবাদ এই যে গৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের বহুপূজিত মূর্তির মধ্যে এই মূর্তিদ্বয়ই আদি এবং গৌরীদাস পণ্ডিতই শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ পূজার আদি পথিকৃৎ। কালক্রমে এই জাগ্রত মূর্তির পূজার ভার নিজ সুযোগ্য ভক্তিপরায়ণ শিষ্য হৃদয়ানন্দের হস্তে ন্যস্ত করিয়া গৌরীদাস বৃন্দাবনধামে যাত্রা করেন। এবং বৃন্দাবনে যমুনাতীরে ধীরসমীর কুঞ্জে স্থাপনপূর্বক শ্রীশ্রীশ্যামরায় বিগ্রহাদীর সেবা নিয়ে পরমানন্দে দিন কাটালেন। উত্তরকালে ভক্তশিষ্য শ্যামরায়ের অপূর্ব সুন্দর মন্দির ও ভক্তনিবাস গড়ে ওঠে। কালের অলঙ্ঘ্য নিয়মে একদিন এই পণ্ডিত ভক্তের মহাজীবনের অবসান ঘটে ৭৫ বৎসর বয়সে ঝুলন ত্রয়োদশীর পবিত্র তিথিতে। তাঁর দিব্যতনু শ্রীশ্রীশ্যামরায় মন্দিরের পূণ্য

আঙ্গিনায় পূর্ণ মর্যাদায় সমাহিত করা হয়। সেই সমাধি মন্দির আজও বিদ্যমান ও নিত্যপূজিত।

বহু ভক্ত অনুরাগী আজও শ্রীশ্রীশ্যামরায় মন্দিরসহ এই সমাধি মন্দির সন্দর্শনে শ্রীশ্রীগৌরভক্তের লীলামাহাত্ম্য উপলব্ধি করে কৃতার্থ ও বিমোহিত হন।

কলিকল্মহারী নামাবতার অনন্তশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথদেব ১৩৭৯ সনে এই ভগ্নপ্রায় মন্দিরের সেবাভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে মন্দিরটির হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। এখনও পর্যন্ত তাঁরই প্রতিষ্ঠিত অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় এই মন্দিরের সম্পূর্ণ দায়িত্বভার নিয়ে মন্দিরটিকে নানাভাবে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে গড়ে তুলেছেন। অখণ্ড শ্রীনামসহ শ্রীশ্রীবিগ্রহের নিত্যসেবা পূজা, দাতব্য চিকিৎসা কেন্দ্র প্রভৃতি সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং স্থানমাহাত্ম্য শতগুণে বর্ধিত হয়েছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ ও গৌরীদাসের এই লীলা-মাধুরী বিভিন্ন বৈষ্ণবগ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে। যথা ঃ

সূর্য্যদাস সরখেল পণ্ডিত উদার।
তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥
শালিগ্রাম হতে জেষ্ঠভ্রাতায় কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈলাবাস অম্বিকা আসিয়া॥
(ভক্তি আকর অন্তিমতরঙ্গ)

শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত, প্রেমোদত্ত ভক্তি
কৃষ্ণপ্রেম দিতে নিতে ধরে মহাশক্তি॥
(চৈতন্য চরিতামৃত, আদি)

সুবলো যঃ প্রিয়ঃ শ্রেষ্ঠ সঃ গৌরীদাস পণ্ডিত।
(গৌরায়নোচ্ছেশ দীপিকা ১২৮ শ্লোক)

''নিগূঢ়ার্থ প্রকাশাবলী'' নামে বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ে পণ্ডিত গৌরীদাস একটি রূপকগ্রন্থও রচনা করেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাই, সর্বস্তরে অনেক ব্যয় বৃদ্ধি হওয়ায় এবং পত্রিকার মান উন্নয়নের সংকল্পের প্রেক্ষায় আমরা এই বৈশাখ ১৪২১ সংখ্যা থেকে 'পথের আলো'র বার্ষিক উপায়ন দেড়শত (১৫০) টাকা ধার্য করতে বাধ্য হচ্ছি। পাঠক ও শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্য, ভক্ত, অনুরাগীগণের প্রতি নিবেদন এই যে, অনুগ্রহ করে বাস্তব অসুবিধা বিবেচনা করে এই উপায়ন বৃদ্ধিটুকু স্বীকার করবেন।

এই প্রসঙ্গে আনন্দের সঙ্গে জানাই 'জয়গুরু' পত্রিকা সংরক্ষণকল্পে এই বৈশাখ সংখ্যা থেকে 'পথের আলো'-তে সংযুক্ত করা হল 'জয়গুরু'। একটি মলাটে দু'টি ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন সাধন উপাচারে সমৃদ্ধ দু'টি পত্রিকা একত্রে নিবেদিত হল এবং পত্রিকায় আরও চিত্র সংযোজনের চেষ্টাও আমাদের থাকবে। শুধু আপনাদের সমর্থন ও সহানুভূতি চাই। সর্বোপরি সহযোগিতা চাই। লেখা পাঠাবেন, পরামর্শও দেবেন।

বিনীত-

সম্পাদক

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ

কিঙ্করী যোগমায়া দেবী

শ্রীশ্রীভগবান আমাদের এই পৃথিবীতে পাঠান এক একজনকে এক একভাবে এক একরূপে। কেউ খুব পরিশ্রমী, কাজেই আনন্দ, কেউ বা তা করতে পারে না। কেউ বা শৌখিন, কেউ বা উদাসীন, কিন্তু ঠাকুর বলেন ''ঐহিকের সুখ হলো না বলে নাম দেব না'' অর্থাৎ পার্থিব সুখ পাওয়া আর নাম নেওয়া বা না নেওয়ার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই। কারণ ঠাকুরই দেন ঐহিকের সুখ, কিংবা দুঃখ, যন্ত্রণা, ঝঞ্ঝাট। আবার তিনি তা থেকে মুক্তি দেন, কখনো দেখান তাঁর মীরাক্কেল ঘটনা। তিনি ধনী, গরীব দেখেন না; কখনো কাউকে অনেক দেন কিন্তু এমন মায়ার জালে আবদ্ধ করেন যে সে আর ঐহিক সুখ ভোগ করতে পারে না। অনেকে সাধু সেজে শ্লোক পাঠ করে ভগবানের কথা বললেও অন্তরে নীচমনা বা খারাপ কথা চিন্তা করছে। অথচ কোন ভক্ত যদি ছেঁড়া জামাকাপড় পড়েও ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রার্থনা জানায় শুদ্ধ মনে দয়া করো প্রভু, তবে তার কামনাই পূরণ হবে। সবার আগে প্রয়োজন অহং জিনিসটাকে ত্যাগ করা। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ সেকথাই বলেছেন।

বই পড়ে মানুষের মধ্যে যে অনুভূতি জাগে তা তার নিজস্ব। অনুভব যার না আসবে তার পক্ষে তা উপলব্ধি করা সহজসাধ্য নয়। তবে গুরুর কাছে সাধনশক্তি, ভক্তি-প্রেম ভালোবাসা সবই থাকে। গুরুর কাছে বসে তাঁর কথা শুনতে শুনতে ভিতরে সেই অনুভব আপনি আসতে থাকে। তাই ঠাকুর বলেছেন অধম ভক্তও পার হয়ে যায় সৎ গুরুর কৃপায়। কেউ হয়ত প্রতিমায় পুজো করে, তিনি যদি ভক্তকেও দেখাতে চান, তবে পুজো করতে করতে তার মধ্যেও সেই অনুভবকে নিয়ে আসতে পারেন। মহাভাগবতে আমাদের জীবনের পাথেয় খুব সহজভাবেই দেওয়া আছে। শুধু নামস্মরণ, আমাদের মনটা কারুর বাধা থাকে না। তাকে ভগবানের কাছে বাধা দিতে হবে। যদি কারো ইচ্ছা করে সারা পৃথিবী ঘুরবে, ভগবানের ইচ্ছায় সে আসনে বসে সারা পৃথিবী মুহূর্তের মধ্যে ঘুরে আসতে পারবে। ''জগন্নাথ, জগ ছাড়া নই মুই ছাড়, তুঁহু জগন্নাথ তুঁহু জগতে বনাইছ''। জগন্নাথ আমাদের জগতের একজন। তাই তাঁর কৃপা আমরা সকলে পাবোই। কিন্তু আমরা যদি আমাদের ঘরকে অপরিষ্কার রাখি তবে গুরুকে এনে বসাতে পারবো না। তেমনি মন-ঘরকে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য থেকে মুক্ত করতে পারলেই সেখানে ঠাকুর বিরাজ করতে পারেন। অনেকে আছে কারোর ভালো দেখলে কষ্ট পায়। কিন্তু এই মানসিক হীনতাকে দূর করে জপ সবসময় ধরে রেখে মনটিকে ঠিক করে 'আমি' বোধ ত্যাগ করে গুরুমুখে সাধনতত্ত্ব গুরুকথা শুনতে শুনতে শিষ্যের মধ্যে সত্য প্রস্ফুটিত হবে।

ঠাকুরকথা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের দোললীলার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। চুঁচুড়ার কমিশনারের বাড়িতে একবার দোললীলা হয়েছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে। তখনকার কমিশনার ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। দোলের দিন ঠাকুর কমিশনার হাউসে ছিলেন বলে সেবিকা এবং সেবক (সেবিকার স্বামী) ভোরবেলা অন্ধকার থাকাকালীন সেখানে পৌঁছে দেখেন ঠাকুর তখন শৌচে যাচ্ছেন, সেখান থেকে এসে ঠাকুর বললেন তিনি গুরুচরণে ফুল ও আবির দেবার পর পুজো নেবেন। তখন সেবক সেবিকা দুজনেই দাঁড়িয়ে রইলেন কারণ তখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। সেবিকা সেসময় প্রতিদিন ঠাকুরের কাছে যেত এবং সারাদিন ঠাকুরের যথাসাধ্য সেবা করে

রাত্রে ঠাকুরকে প্রসাদ খাইয়ে ফিরে আসতো। যাইহোক সেদিন ঠাকুর গুরুচরণে পুজো করে সেবিকাদেরও পাদুকা প্রণাম করালেন। সেবক সেবিকা ঠাকুরকে আবির দিয়ে প্রণাম করলে ঠাকুরও আবির মাখিয়ে দিলেন। এরপর সেবক ঠাকুরকে প্রণাম করে বাড়ি চলে গেলেন কারণ বাড়িতে ছোটছোট ছেলেমেয়েরা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর সেবিকাকে এরপর বললেন, 'দেখ মা, এর বড় ইচ্ছা হচ্ছে'; সেবিকা কী ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করলে ঠাকুর বলেন সব বাবা-মায়েদের দোল খেলার জন্য এবং প্রসাদ নেবার জন্য ডাকা হোক এটাই তাঁর ইচ্ছা। সেবিকা তখন ঠাকুরকে বলেন রামপ্রসাদদাকে তার শ্বশুরবাড়ির জগদ্ধাত্রী পুজোর বাসন এবং তার ননদ রাজলক্ষ্মীকে নিয়ে আসার জন্য। ঠাকুর খুব খুশি হলেন। কিন্তু দোকান সব বন্ধ, ময়দা, আটা, ঘি কোথা থেকে পাওয়া যাবে চিন্তা হলে, ঠাকুরের এক শিষ্যা স্নেহলতার বাড়ি থেকে ৮-১০ কেজি-র আটা ছিল তা আনার কথা বলা হলো। ঠাকুর বললেন লুচি, আলু, কপি দিয়ে মুগের ডাল, আলুর দম, চাটনী, পায়েস এবং শুভকাজ বলে শাকও করতে বললেন। কিছুক্ষণ বাদে চন্দননগরের বিশু পাল এলে সেবিকা ঠাকুরের রান্নার কথা বললে তিনি গাড়ি নিয়ে চন্দননগরে চলে গেলেন জিনিসপত্র কেনার জন্য। কিছুক্ষণ বাদে চন্দননগরের এক ময়রার দোকানের দরজা খুলতেই তার সমস্ত ময়দার বস্তা এবং যতটা ডালডা ছিল সব নিয়ে চলে আসে। আবার হরি নন্দী নামে হাওড়ার এক পুরোনো ভক্ত এক বস্তা ময়দা, এক টিন রসগোল্লা আর একটিন ঘি নিয়ে এসে ঠাকুরের কাছে কাতর প্রার্থনা জানান সেসব ভোগে নিবেদন করার জন্য। তখন ঠাকুর খুশি হয়ে বলেন, নিশ্চয়ই লাগবে, ভোগে লাগাবার জন্যই আমরা সবাই ছট্‌ফট্‌ করছি। যাইহোক হরি নন্দীর এবং বিশুর আনা সব জিনিস দিয়ে প্রসাদের ব্যবস্থা শুরু হয়ে গেল। সেবিকা একটি উনুন নিয়ে এবং দুর্গার ভাই অচলও একটি ছোট উনুন নিয়ে লুচি ভাজতে লাগলো। সবকিছু ঠাকুর কৃপা করে জোগাড় ও ব্যবস্থা করে দিলেন। এরপর ঠাকুর সবাইকে নিয়ে দোল খেললেন এবং গঙ্গাস্নান করলেন; সে যে কী আনন্দ তা মুখে বলে বা লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। চুঁচুড়ার এক শিষ্যা দোলের আগেরদিন মনে করেছিল ঠাকুর তার এত কাছে রয়েছেন, ঠাকুরের চরণে একটু আবির দিয়ে প্রণাম করে আসবে কিন্তু কমিশনার হাউসের পুলিশ তাকে যেতে বাধা দিলে সে আবিরের প্যাকেট পুলিশের হাতে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে যায়। কিন্তু ঠাকুর যে আমাদের দয়াময় অন্তর্যামী, তাই সকলের চোখের জল মুছিয়ে তাদের কামনা পূরণের জন্যই তিনি এই দোল খেলার লীলায় মেতে উঠেছিলেন সকল শিষ্য-শিষ্যাকে নিয়ে। ঐ শিষ্যা ঠাকুরের ডাক পেয়ে যেন বসন্তের আনন্দ হিল্লোলে বিহ্বল হয়ে পড়ে। শুধু আবির খেলা নয়, গঙ্গাস্নান ঠাকুরের সঙ্গে সে যে জীবনের চরম আনন্দকে অনুভব করা, এ যেন গোপিনীদের নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাখেলা। ঠাকুর গেটের পুলিশদের সকলকে আবির মাখিয়ে চুমু খেয়ে বলে দিয়েছিলেন যে তারা যেন সমস্ত বাবা-মায়েদের ঢোকার ব্যবস্থা করে দেন। ভক্তদের প্রেম ভালোবাসায় ভগবান তাঁর ভক্তদের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, সেইজন্য গোপীরা যখন ভগবান কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করে যে ভগবান কৃষ্ণ কী বৃন্দাবনে আসবেন না, তাঁর কী গোপীদের কথা মনে পড়ে না? সে কথায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন 'তোমরা আমার ভিতরে আছ এবং সর্বসময় মনে পড়ে তোমাদের কথা।' গোপীপ্রেম বিকশিত নয়, তাই গোপীপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেম সে কথা ভাগবতে আছে। এই লীলাকথা ভাগবত কথা; সীতারাম লীলা।

শ্রীগুরুরূপে এসেছিলে ভগবান
মোদের তরে সদাই কাঁদিত প্রাণ।
মনটি করিয়া চুরি
মোদের সাথে খেলেছিলে লুকোচুরি।
বাহিরে আজি খুঁজিয়া না পাই।
দেখি হৃদয় মন্দিরে নিয়েছ যে ঠাঁই,
ওগো অন্তরতম তোমার অন্ত না পাই,
আজি সারা বিশ্বের অন্তরে আছো ভগবান॥

সাঁইবনা শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দির

শ্রী শম্ভু দেবনাথ

নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে, হৃদয়ে রয়েছ গোপনে॥
-রবীন্দ্রনাথ

পরম এবং চরম ভাগবতী সত্ত্বায় স্থিতিকালে 'সো♦হং'---আমিই সেই---এই মহানাদ---যা শ্রীশ্রীসীতারাম 'কতবার কতভাবে লাভ করেছেন' ভাক্তাগ্রগণ্য বিঠ্ঠল রামানুজজীর 'নব নব রূপে এসো' দ্বিতীয় খণ্ডে ৯২-৯৩ পৃষ্ঠায় তা বর্ণিত হয়েছে। ফটোতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁর উত্তোলিত বাহুর মুদ্রা যেন সেই সো♦হং ভাবেরই দ্যোতক।

বাহ্যতঃ তুমি তোমার মতো, আমি আমার মতো, সে তাঁর মতো—সবাই এক এবং অদ্বিতীয়—এক সেবা দ্বিতীয়ম্। কিছু সাদৃশ্য হয়তো পরিলক্ষিত হতে পারে কিন্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঢুঁড়ে ফেললেও তোমার, আমার বা তাঁর মতো হুবহু কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এ এক অত্যাশ্চর্য রূপের খেলা। অথচ প্রতিটি মানব দেহেই চোখ, মুখ, নাক, কান, গলা ইত্যাদি সমস্তই যথাস্থানে সন্নিবেশিত। যথানুরূপ সাদৃশ্যের মধ্যে এত বৈসাদৃশ্য কেন আর এত অনন্ত রূপই বা কী করে হল? শুধু তাই নয়, এক একজনের চলন, বলন, রুচি, স্বভাব, কণ্ঠস্বর, হস্তাক্ষর এক একরকম, ভিন্ন ভিন্ন। এভাবে অনন্তকাল থেকে তুমি, আমি এবং সে এক এবং স্ব স্ব স্বাতন্ত্রতা নিয়ে জন্মেছে, বর্তমানে জন্মাচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও জন্মাবে। সেজন্য লক্ষ লক্ষ অচেনা লোকের মাঝখানে একজন পরিচিত লোককেও চেনা যায়। শুধু মনুষ্যই বা কেন, মনুষ্যেতর জীবদেহও একইভাবে জন্মাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'তিনিই সব হয়েছেন।' সবই তিনি না হলে, এত অনন্ত রূপের সৃষ্টি কি কেউ করতে পারে, না করা সম্ভব? তিনি সকলের মধ্যে ঈশ্বরকেই দেখতেন। তাই লোক সমাগম হলে, তাঁর উদ্দীপন হত। বস্তুত যাঁর শক্তি আছে, তাঁর প্রকাশও আছে। যাঁর অনন্ত শক্তি, তাঁর প্রকাশও অনন্ত। ভুবনলোকে ভুবনেশ্বর হয়ে তিনিই অনন্তরূপে, অনন্তভাবে নিজেই নিজেকে আস্বাদন করছেন।

বলা হয়, সর্বদেহে তিনিই অবস্থান করছেন। ভাল কথা। কিন্তু তিনি যে সর্বদেহে অবস্থান করছেন, তার কিছু লক্ষণ, কিছু চিহ্ন তো থাকবে। আছে বৈকি! এই অনন্ত স্বাতন্ত্রতা, এই অনন্ত বৈচিত্র্য—এটাই তো তার লক্ষণ। 'বহুস্যাং প্রজাযেয়েতি'—এক বহু হব—এই সংকল্প থেকেই তো এত অনন্ত রূপের, ভাবের প্রকাশ। কিন্তু সকলের মধ্যে সেই এককেই দেখা, অনুভব করা, সেটাই বা কয়জন পারে? জ্ঞানহীন, ভক্তিহীন, সংসারের আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা সংসারী লোক কয়জনেরই বা এই বহুত্বের মধ্যে একত্ববোধ আছে বা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দকে সখেদে বলতেন, তোর এখনও ভেদবুদ্ধি গেল না।' সংসারী মানুষ তো এই ভেদবুদ্ধির মধ্যেই নিজেকে হারিয়ে ফেলে। একানুভূতির ছিটেফোঁটাও তার মধ্যে থাকে না। তাই তো এত দ্বন্দ্ব, এত অশান্তি।

ঈশ্বরের স্বরূপ সৎ, চিৎ এবং আনন্দ। ভাল হোক, মন্দ হোক—সবাই আমরা সুখ, তৃপ্তি, আনন্দই পেতে চাই। সকলের চিন্তা, ভাবনা, কর্ম তৎপরতা—সকল কিছুর অভিমুখ সেই সুখ, তৃপ্তি এবং আনন্দের দিকে। 'আনন্দাদ্ধ্যের খল্বিমানি ভূতানি যায়কে।' আনন্দ থেকেই জাত এবং আনন্দেই লয়। এবং সব সময়েই একটা নিরবচ্ছিন্ন সুখ, তৃপ্তি এবং আনন্দ পেতে চাই। কিন্তু পৃথিবীতে যে সবের মধ্যে আমরা সুখ, তৃপ্তি বা আনন্দ পেতে চাই সে সবের সুখ, তৃপ্তি

বা আনন্দ দেবার শক্তি সীমিত। তাই অজস্র আয়োজনের মধ্যে আমাদের সুখেচ্ছা, আনন্দ লাভের ইচ্ছা বহুধা বিভক্ত। ঈশ্বরের এই অনন্ত লীলাবিলাসও সেই সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপেরই প্রকাশ। এই প্রকাশে কোন ক্লান্তি নেই, ক্ষান্তি নেই, চলছে তো চলছে অনন্তকাল ধরে।

বসেছিলাম সাঁইবনার শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দিরের কথা লিখতে। এসে গেল এত সব কথা। সবই শ্রীশ্রীসীতারামের ইচ্ছা। তা না হলে কোথায় এবার গুরুপূর্ণিমায় মহামিলন মঠে যাব। তা না, এবার শ্রীশ্রীঠাকুর যেন অলক্ষ্যে থেকে বললেন, 'এবার গুরুপূর্ণিমায় সাঁইবনা শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দিরে যা।' অবশ্য এর একটা প্রেক্ষাপটও ছিল।

সীতারামের কৃপায় এয়ারপোর্টের কাছে কৈখালিতে ছোট্ট একতলা বাড়ি তৈরি করেছিলাম। বাড়ির নাম 'শ্রীওঙ্কারভবন'। গতবছর দোতলা করার কাজে হাত দিই। বাড়ি শুরু করার আগে বাসে পকেট থেকে আমার মোবাইলটি হারিয়ে যায়। আরেকটা মোবাইল কেনা হল। মোবাইলটি activated হওয়ার পর সর্বাগ্রে মনে হল দোতলা শুরুর আগে বিঠ্ঠলজীর আশীর্বাদ নিই। প্রথম কলটি তাঁকেই করি এবং পেয়েও যাই। দোতলা শুরু করার জন্য তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তিনি সানন্দে বললেন, 'আমি আশীর্বাদ করছি।' এদিকে দোতলা শুরু হওয়ার আগেই একরাতে স্বপ্নে দেখলাম বিঠ্ঠলজী বাড়ির বহির্দেশে দাঁড়িয়ে বাড়ির উপরিভাগ লক্ষ্য করছেন। তাঁর আশীর্বাদ অমোঘ, অপ্রতিরুদ্ধ। যে যে বিষয়ে আশঙ্কা ছিল, সে সবের বিন্দুমাত্র হয়নি। মসৃণভাবে দোতলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

আমার সংকল্প ছিল, যেদিন দোতলায় শিফ্‌ট করব, সেদিন করুণাঘনমূর্তি বিঠ্ঠলজীকে এ বাড়িতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাব। তাঁর শ্রীচরণস্পর্শে ধন্য হবে এ বাড়ি। কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানলাম, তিনি ওঙ্কারেশ্বরে আছেন। কী আর করা যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুর যাতে প্রীত হন, তারজন্য অন্তত নাম সংকীর্তন হোক। তাই আমাদের অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের সুযোগ্য নামকারী নয়নদাকে ফোন করে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানালাম। তিনি এককথায় রাজী হলেন। নয়নদার নির্দেশ মতো খোল ও হারমোনিয়ম যোগাড় করা হল। যথাসময়ে নয়নদাকে নিয়ে মোট আটজন, তার মধ্যে চারজন গুরুভগিনী, ১৬ই মে ২০১৩ ওঙ্কার ভবনে এলেন। প্রথমে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রবর্তিত ত্রৈকালিক স্তবমালা থেকে প্রার্থনা দিয়ে শুরু হল। তারপর বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে সুললিত কণ্ঠে দু'ঘণ্টা ধরে নামকীর্তন হল। নামকীর্তনে আমাদের আশেপাশের বাড়ি থেকেও অনেকে এসে নাম শুনলেন।

নাম শেষে নয়নদার নির্দেশে নামকারীদের মিষ্টির প্যাকেট দিয়ে আপ্যায়ন করা হল। তারপর নয়নদা আগত নামকারীদের ভাড়া বাবদ এবং সাঁইবনা শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দিরের সংস্কারকল্পে কিছু সাহায্য দিতে বললেন। সাধ্যমতো দিলাম।

'নব নব রূপে এসো'র প্রথম খণ্ডে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরের তালিকার ৫৭ নম্বর সিরিয়ালে সাঁইবনা শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দিরের উল্লেখ আছে। দুর্ভাগ্য এই যে, দীক্ষা নেবার তেত্রিশ বছরে একবারও সাঁইবনা যাওয়া হয়নি। নয়নদা শুনে বললেন 'একবার সাঁইবনা যাবেন।' ইচ্ছা প্রকাশ করে বললাম 'যাব।'

অবশেষে যাবার একটা সুযোগ এল। কি করে এল, এবার সেই কথাই বলি।

আমার ডান চোখে ছানি পড়েছিল। আমি Central Govt. Health Scheme-র সদস্য হওয়ায় ছানির অপারেশনের জন্য আমাকে C.G.H.S. অনুমোদিত চক্ষু হাসপাতাল সল্টলেকে 'শুশ্রুত-এ পাঠানো হয়। অপারেশনের পর থেকেই যে যন্ত্রণা, অস্বস্তি শুরু হল, তার জের এখনও চলছে। তারপর মুকুন্দপুরে শঙ্কর নেত্রালয়ে, কলকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগে বহুবার দেখানো হয়েছে। কিন্তু ড্রপ ছাড়া কেউ কোন আশু সমাধানের উপায় দিতে পারেনি। আমার ভাবতে অবাক লাগে, চিকিৎসকদের দুষ্কর্মের ফলে আমার ডান চোখটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

অবশেষে ব্যারাকপুর 'দিশা'-তে ডাঃ সমর কুমার বসাককে দেখাই। উনি আই ব্যাঙ্ক থেকে দান করা মরণোত্তর চোখ দিয়ে আমার ডানচোখে অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটা অপারেশন করেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় এখন একটু ভাল আছি। যে চোখে প্রায় কিছুই দেখতাম না, সেখানে মোটামুটি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছি। তাই মাঝে মাঝেই দিশায় যেতে হয় চোখ দেখানোর জন্য। আশ্চর্য্যের ব্যাপার গুরুপূর্ণিমার দিন (২২ জুলাই, ২০১৩) অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ডেট পেলাম।

নয়নদা ব্যারাকপুর থেকে ৮১ নম্বর বাসে বারাসাত-ব্যারাকপুর রোডে মাতারাঙ্গি মোড়ে নেমে ভ্যানে করে যেতে বলেছিলেন। ভ্যান ছাড়া মন্দিরে যাওয়ার অন্য কোন যানবাহন নেই।

বেলা বারোটার মধ্যেই চোখ দেখানো হয়ে গেল। তারপর বাস ধরে আধঘণ্টার মধ্যেই মাতারাঙ্গি মোড়ে পৌঁছে গেলাম। সেখান থেকে ভ্যানে করে সাঁইবনা মন্দির যাওয়ার সময় মনে হল মন্দির বেশ অনেকটা দূরে, আন্দাজ পাঁচ কিলোমিটার হবে! ভ্যান থেকে নেমেই চোখে পড়ল শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দির। একটা পুকুরের পোল দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম মন্দিরের সুবৃহৎ দরজা বন্ধ। তবে পাশেই একটা ছোট্ট দরজা আছে। তা দিয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম। আমার ধারণা ছিল গুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে মন্দির পত্রপুষ্প মালায় সুসজ্জিত থাকবে। প্রচুর ভক্ত সমাগম হবে। কিন্তু তেমন কিছু চোখে পড়ল না। মন্দিরের সম্মুখে একটা নাটমন্দির। তারপর একটু ফাঁকা জায়গায় সিঁড়ি দিয়ে উঠে মূল মন্দির। মন্দিরে নাম হচ্ছিল। নামকারী এবং শ্রোতা মিলে বিশ-পঁচিশ জন। মন্দিরের সুউচ্চ বেদী উপরে সুদৃশ্য আসনে শ্রীশ্রীনন্দদুলাল ঠাকুর ও ঠাকুরাণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। ডানদিকে উপবিষ্ট অবস্থায় হাস্যোজ্জ্বল শ্রীশ্রীসীতারামের পূর্ণাবয়ব মূর্তি এবং তাঁর পাশে প্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্তি।

নয়নদা বলেছিলেন কর্মাধ্যক্ষ দেবানন্দজীকে আমার কথা বলে রাখবেন। অফিস ঘরে তাঁকে পাওয়া গেল। বাইরে থেকে পরিচয় দিতেই ভিতরে যেতে বললেন। ভিতরে ঢুকলে বললেন, 'চোখ দেখাতে ব্যারাকপুর গিয়েছিলেন?' হ্যাঁ বলতেই বললেন, 'নামে গিয়ে বসুন। তারপর মন্দিরের চারপাশটা ঘুরে দেখুন।'

বললাম 'আমি কিছু প্রণামী দিতে চাই।'

দেবানন্দজী বললেন 'আগে প্রসাদ পান। তারপর দেবেন।'

নামে গিয়ে বসলাম। খোল, করতাল, হারমোনিয়ম সহযোগে নাম হচ্ছিল। মাঝে মাঝে একটু বিরতি হচ্ছিল। কারণ নামকারীর সংখ্যা অল্প। একজন মায়ী নাম করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তা জেনে এক পক্ককেশ বৃদ্ধলোক বললেন 'বৌমা নাম করতে চায়। তোমরা বাজাও।' মায়ী সুকণ্ঠের অধিকারিণী। কিছুক্ষণ ধরে সুরেলা কণ্ঠে সুমধুর সুরে নাম করলেন।

কিছুক্ষণ নাম থেকে মন্দির থেকে বেরিয়ে চাতালে নামতেই দেখলাম সামনে পাশাপাশি দু'টো শিবমন্দির। দর্শন প্রণাম সেরে মন্দির থেকে নেমে চারদিক তাকিয়ে দেখলাম প্রচুর গাছপালায় ভরা বিস্তীর্ণ এলাকা নিয়ে মন্দিরের চৌহদ্দি। স্নিগ্ধ, নির্মল এক নৈসর্গিক নিস্তব্ধতার মাঝে যেন শ্রীশ্রীনন্দদুলাল ঠাকুর এবং ঠাকুরাণী বিরাজ করছেন। ঘাসে আচ্ছাদিত একটা পায়ে চলা মেঠো পথ ধরে খানিকটা এগিয়ে দেখি একটা খাল। কেষ্টপুর বা বাগজোলা খালের সঙ্গে এর কোন তফাৎ নেই। একইরকম কালো জল। তবে কোন দুর্গন্ধ নাকে এল না। দেখলাম গোশালা, তাকে কয়েকটি দুগ্ধবতী গাভী রয়েছে। গুরুপূর্ণিমায় তেমন ভক্ত সমাগম না হলেও মন্দিরের পেছনে রক্ষিত রান্নার বৃহদাকার তৈজসপত্র দেখে মনে হল, শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে প্রচুর ভক্ত সমাগম হয়। তবে প্রতিদিনই প্রসাদের ব্যবস্থা আছে সেদিন ন্যূনধিক পঞ্চাশজন ভক্ত এসেছিলেন।

দেবানন্দজী ভোগরাগের আরতি শুরু করলেন। আরতি শেষ হওয়ার পর প্রসাদ নেবার ডাক এল। অফিস ঘরের পাশের দরজা দিয়ে ঢুকে বারান্দা। বাইরে একটা উঠান। উঠানের দু'দিকে আসন পেতে প্রসাদ নেবার ব্যবস্থা। একদিকে অবশ্য টেবিলে প্রসাদ নেবার

ব্যবস্থাও ছিল। পরিবেশনে উপবীতধারী একজন সেবক এবং স্বয়ং দেবানন্দজীও হাত লাগালেন। সুশৃঙ্খল মতো সবাই প্রসাদ পেলেন।

প্রসাদ পাওয়ার পর্ব মিটে যেতেই যে যার গন্তব্যস্থানে রওনা হলেন। মন্দির প্রায় ফাঁকা হয়ে গেল। দেবানন্দজীকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, মন্দিরের সেবাকার্যে দু'জন আছেন। দেবানন্দজীর সঙ্গে পুনরায় দেখা হতে বললেন, 'এখন আর অফিস খুলবে না। প্রণামী বাক্সেই যা দেবার দিন।' তাই দিলাম।

বেলা প্রায় তিনটে। বর্ষাকাল। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। শ্রীশ্রীনন্দদুলাল ঠাকুর ও ঠাকুরাণীকে প্রণাম জানিয়ে গুটি গুটি মন্দিরের বাইরে চলে এলাম। সামনে একটা পুকুরে শান বাঁধান ঘাট। ঘাটে বসার ব্যবস্থা আছে। এখানকার নিস্তরঙ্গ, শান্ত পরিবেশ আমার ভাল লাগছিল। পুকুরের ঘাটে বসে পড়লাম। এক ভদ্রলোক এসে আমার পাশে বসলেন। জিজ্ঞেস করে জানলাম, উনি কাছেই নীলগঞ্জ রোডে থাকেন। বড় ছেলে আর্মিতে চাকরি করে। ছুটি নিয়ে বাড়ি এসেছে। বাড়ির সবাইকে নিয়ে শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দিরের প্রসাদ খাবে বলে আগেই কুপন কেটে নিয়ে গিয়েছিল। একটু বাদেই আর সবাই এসে গেল। যাবার আগে ভদ্রলোক বলে গেলেন, মন্দিরের দেওয়াল ঘেঁষে যে রাস্তাটা ভিতরের দিকে গেছে সেই রাস্তা দিয়ে কিছুদুর গেলেই মোড় পড়বে। সেখানে ভ্যান পাওয়া যাবে। আরও কিছুক্ষণ বসে রইলাম। এদিকে টিপ্‌টিপ্‌ করে বৃষ্টি শুরু হল।

ভদ্রলোকের কথামতো ভিতরের রাস্তা ধরে বড় রাস্তায় এসে এগিয়ে চললাম। কোথায় কোন্‌ মোড়ে ভ্যান পাওয়া যায়, কিছুই বুঝলাম না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ। তার ওপর বৃষ্টি। কোথাও দাঁড়াতে ভরসা হলো না। আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগলাম। ভাবছিলাম, বাসরাস্তা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াই বোধহয় আজ ভাগ্যে আছে। সাইকেল, বাইকের আনাগোনা ছাড়া কোথাও কোনও কোলাহল নেই, সবই মৃদু, মন্থর।

হাঁটতে হাঁটতে সেই কালো জলের খাল ব্রীজের ওপর দিয়ে পেরিয়ে এলাম। তবে আমার মনে কোন দুঃখ বা ক্লেশ বোধ হচ্ছিল না। ডানদিকে সুউচ্চ প্রাচীর দেওয়া বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডকে সাহেবের বাগান বলে জেনেছিলাম ভ্যানওয়ালার কাছে। শুধু গাছপালা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে নাকি সরকারী দপ্তর আছে।

এগিয়ে চলেছি। হঠাৎ দেখি পেছন থেকে এক ভ্যানওয়ালা আসছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম মাতারাঙ্গি মোড় যাবে? ভ্যানওয়ালা সম্মতি জানাল। আমি ভ্যানে উঠে বসলাম। যারা ভ্যান চালায় তাদের অধিকাংশ হয় লুঙ্গি, না হয় প্যাণ্ট পরে। কিন্তু এই ভ্যানওয়ালাকে দেখে একটু আশ্চর্য লাগল। কারণ, এই ভ্যানওয়ালার পরণে ধুতি, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক এবং তিলকের মাঝে ছোট্ট একটা লাল রংয়ের ফোঁটা। বেশ ভক্তি বিনম্র ভাব। তখনই আমার মনে কোনও ভাবান্তর হল না। যাইহোক পথে আর কোন যাত্রী উঠল না। একা আমাকে নিয়েই মাতারাঙ্গি মোড়ে নামিয়ে দিল। ভাড়া কত দেব জিজ্ঞেস করতে বলল 'ছ' টাকা। পকেটে খুচরো ছ'টাকা ছিল। তাই দিলাম। রাস্তা পেরিয়ে বারাসাতের বাস ধরবার জন্য উল্টোদিকের ফুটপাতে চলে এলাম।

সামনে তাকিয়ে দেখি, তাই তো কোথায় গেল সেই ভ্যানওয়ালা! নেই তো! তাহলে এত তাড়াতাড়ি গেল কোথায়!

এই প্রশ্ন আজও আমার মনে চলছে, ভ্যানওয়ালা গেল কোথায়?

আঁধার পেরিয়ে আলোর প্রভাতে

শ্রী জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়

আমার বাবা-মার দীক্ষা

আমাদের জীবনে কর্ণধাররূপে ঠাকুরের আবির্ভাব আমার ছেলেবেলায়। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। প্রথম ধাপে আমার বাবা-মা তাঁর অভয়াশ্রম লাভ করেন। তাঁদের দীক্ষা হয় দিগ্‌সুই ধামে, তারিখটা ছিল ১লা মাঘ ১৩৬৬ (ইং ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৬০) দিনটি ছিল শুক্রবার। তাঁর শ্রীচরণে আমার আশ্রয় হয় তার পর। স্কুলের গণ্ডি পেরুবার পর ঠাকুরের ভালবাসার শক্তবাঁধনে বাঁধা পড়ি। তারপর কত কথা, কত হাসি, কত স্নেহ, কত আদর, কত ভালবাসা, আমাদের বদ্ধাঞ্জলি আহ্বানে কতবার বাসগৃহে তাঁর শুভাগমন, পুরাতন আস্তানা ছেড়ে নতুন গৃহে চলে আসার পরও তাঁর বারংবার পবিত্র শ্রীচরণদূলি লাভে ধন্য হওয়া, এমনকি বাড়িটি তৈরী হওয়ার সময় কাটা ভিতের ওপর তাঁর শ্রীচরণধূলি লাভ...। আজ জীবনের অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে বিগত সেই আনন্দময় সময়ের কথা অনুরণন করলে মনটা শ্রদ্ধাপূর্ণ বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভাবি, তাঁর মতো বিশ্ববন্দিত পুরুষ কিভাবে আমার মতো একটা অতি সাধারণের সাধারণ ছেলেকে এত ভালবাসা বাসলেন, কিভাবে এই গুণহীনকে 'শ্রীরামপুরের জয়ন্ত' বলে একডাকে চিনতেন! যাক্, সে আনন্দ স্মৃতিচারণা অন্যত্র।

বাবা-মা'র দীক্ষার পর স্কুলের সীমানা পেরুবার আগে অনেকবারই তাঁর দর্শন পেয়েছি, তবে তখন তাঁদের পাশ থেকে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয়, বিস্ময়, লজ্জা, জড়তা মেশানো ভাব নিয়ে। যে সময়ে তাঁরা ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন তখন দীর্ঘ দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে বেসামাল অবস্থায় চলছিল আমাদের দিনগুলো। যেন ঝড় বিক্ষুব্ধ দুরন্ত জলধি মাঝে ভাঙ্গাহাল-ছেঁড়াপাল- হেলেপড়া-ডুবন্ত একটা নৌকোর মতো সংসারের অবস্থা। এখন মনে হয় দুর্যোগময় সেই সাংসারিক পরিস্থিতিই যেন সেদিন আমাদের অজ্ঞাতে ঠাকুরের আগতপ্রায় কৃপার ইঙ্গিত দিচ্ছিল। যে দুর্যোগের স্বাভাবিক পরিণতি হত বিয়োগান্ত এক্ষেত্রে তাহল মধুরাতিমধুর মিলনান্ত। শ্রীভগবানের চিরকালের এই অম্লমধুর ভাঙ্গাগড়ার খেলা ভক্তসাধকের লেখনীমুখে প্রকাশ পেয়েছে অপূর্ব ভক্তিপ্লুত কাব্যিক সুষমায়ঃ

"যাঁর ইচ্ছা হতে নেমে আসে বিপর্যয়
তাঁর ইচ্ছাতেই শেষে সব মধুময়।
ভাঙ্গাগড়া খেলা তাঁর লীলা চিরন্তন
হর্ষশোকে অভিভূত মোরা অকারণ।"
(শ্রীশ্রীলীলাচিন্তা, ১ম খণ্ড - ২৭, পৃ. ১৬৭)

আজ মনে হয়—দুর্যোগও ছিল তাঁরই অভিপ্রেত। দুর্যোগের মধ্য দিয়ে দুর্যোগ হরণের দিব্যকৃপা। কি সে দুর্যোগ কিভাবে তার মধ্য দিয়ে ভয়ের ভয় অভয়দাতা পরম করুণাময় ঠাকুরটি তাঁর অভয়বাণী নিয়ে কৃপা করতে আবির্ভূত হলেন সেই স্মৃতিকথাই পূর্ব-পর স্মরণ করে চলেছি।

এইখানে একবার আসি আমার মার কথায়, পরবর্তী সময়ে যিনিও ঠাকুরের অশেষ কৃপালাভ করে ধন্য হয়েছিলেন। সে স্মৃতিকথার অন্যত্র অবতারণা করার ইচ্ছা রইল। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল ঠাকুরের ইচ্ছায়। মা ছিলেন আমার অত্যন্ত ভক্তিমতী। অল্পবয়সে ঠাকুর দেবতার পূজা-উৎসবের পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন তিনি। আমাদের করুণাময় ঠাকুরের কৃপালাভের পূর্বেও ছোট থেকে তাঁকে দেখেছি নিত্য সকাল সন্ধ্যায় ঘরে ধূপধূণা জ্বালিয়ে দেবদেবীর ছবির সামনে বসে হাততালি দিয়ে একান্তমনে হরিনাম করতে। কাছাকাছি থাকলে, আমাকেও নিয়ে বসে হাততালি দিয়ে হরিনাম

করতে শেখাতেন। আমার পাড়ার বন্ধুদের ডাকতেন আমার সঙ্গে হরিনাম করতে বসার জন্য। যদিও সে ডাকে তাদের সাড়া মেলেনি। মনে পড়ে মা প্রতিদিন হাততালি দিয়ে একটি গুরুবন্দনা গান করতেন। আমি করেছি কতদিন মার সঙ্গে বসে।

অবশেষে বুঝি গুরুদেবের দয়া হল। তাঁর কৃপার অদৃশ্য স্পর্শ তাঁকেই প্রথম ছুঁয়ে গেল। মা ঠাকুরের দর্শন, স্পর্শন ও দীক্ষালাভের জন্য আকুলিত হলেন।

দীক্ষা নেওয়ার ব্যাপারে বাবার ছিল ঘোরতর আপত্তি। তিনি মনে করতেন যে উচ্চকোটির সাধু-মহাত্মারা অবশ্যই আছেন, তবে তাঁদের সচরাচর দেখা মেলে না। সুতরাং না জেনেশুনে হঠাৎ কোনও সাধুবাবা দেখলেই তাঁর পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়া ও দীক্ষা নিয়ে নেওয়া ছিল প্রকৃতি বিরুদ্ধ। মার চাপাচাপিতে শেষে দর্শন করতে যেতে নিমরাজি হলেন। শেষে দীক্ষাও হল। ঠাকুরটি যেন তাঁর কাছে তাঁর মতো করে আত্মপ্রকাশ করেই তাঁকে দীক্ষা দিলেন। সেই কাহিনীর দিকেই আমরা ধাপে ধাপে এগুচ্ছি কারণ তার পূর্বে যা যা বলা হচ্ছে, অনুভবী ভক্ত-মাত্রই বুঝবেন, তার মধ্যে ঠাকুরের অদৃশ্য হাতছানি আর কৃপার ইশারা ছিল। যে বাবা হঠাৎ দীক্ষা নেওয়ার এত বিরোধী ছিলেন, যাঁকে দীক্ষার পূর্বে কোনদিন আসনে বসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না, তিনিই আমূল পাল্টে গেলেন ঠাকুরের কাছে আশ্রয়লাভের পর। নিয়মিতভাবে প্রতিদিন দীর্ঘক্ষণ জপধ্যান করতেন, দীর্ঘ সময় ধরে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতেন। অবসর সময়ে মুখে নাম করতেন। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জৈবিক কারণে তাঁর চলাফেরা যখন বাসগৃহের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হল তখন দিনের অধিকাংশ সময়ই মুখে মুখে তাঁর নাম চলত, কোনসময় নামজপ ও অন্য মন্ত্র জপ। ঠাকুর বলতেন সদাসর্বদা নাম করতে, উঠতে-বসতে, খেতে-শুতে, চলতে-ফিরতে নাম করতে। আবার তিনি 'ক্ষোপার ঝুলি'তে লিখেছেন ঃ ''...দেখ, মানুষ ইচ্ছা করিলেই সদাসর্বদা নাম করিতে পারে না—যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্তশুদ্ধি না হয়, সেই চিত্তশুদ্ধি করিবার জন্য স্মৃতিশাস্ত্র।'' (দ্বার ও পথ) বাবাকে দেখেছি নিম্নস্বরে ক্রমাগত নাম করে যেতে। জীবনের শেষ অঙ্কেও একরকম। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম না আসা পর্যন্ত নাম চলত। কিছুদিন আগে শতায়ুপূর্ণ করে তিনি শ্রীসীতারামলোকে চলে গেছেন। যাবার পূর্বদিন দেখি সর্বদা গলায় পরা ঠাকুরের প্রতীকটি মুখের কাছে এনে অস্ফুট স্বরে কিছু বলছেন। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'ভগবানের নাম' করছি। স্থানীয় অঞ্চলে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। অনেকে তাঁকে শেষের দিকে বাড়ীতে দেখতে ও প্রণাম করতে আসতেন। তাঁর মরদেহ নিয়ে শেষযাত্রার সময় স্থানীয় বহুমানুষ তাঁর যাত্রাপথের স্থানে স্থানে সমবেত হয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। ছয় ভাইয়ের সর্বকনিষ্ঠ ভাই। তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই পৈত্রিক পরিবারের পিতা-পিতৃব্যদের প্রজন্ম শেষ হল। আজ তিনি নেই। ঠাকুরটি কিভাবে কোন অবস্থার মধ্যে কেমন করে আমার বাবা-মাকে দিয়ে শুরু করে আমাদের আত্মসাৎ করলেন সেই ইতিবৃত্ত স্মৃতির পর্দায় ফিরে দেখছি।

যে পারিবারিক দুর্যোগের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি সেই দুর্যোগের শুরু হয়েছিল আমার বাবার হঠাৎ ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ার মধ্যে দিয়ে। একসময় প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। আমাাদের বাবা-মা, একটি ছোট ছেলে আর তার থেকেও ছোট এক বোনকে নিয়ে চারজনের কোনওরকমে চলে যাওয়া একটি মধ্যবর্তী পরিবারে তিনিই একমাত্র রোজগেরে। চাকরি কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে হলেও অস্থায়ী চাকুরি। সেই চাকরিতে যাওয়া দীর্ঘদিনের জন্য তাঁর অসুখজনিত অসমর্থতার জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সংসারের ফল হাল বেহাল। আমার স্কুলের পড়াও প্রায় পূর্ণছেদের মুখে চলে এলো। অসুখের বিবরণে যাচ্ছি না বিশেষ। মূলতঃ হঠাৎ হঠাৎ হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে মনে হত তিনি এবার বুঝি শেষ হয়ে যাবেন। বড় বড় ডাক্তাররা দেখলেন, কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে দেখানো হল। স্কুল অব ট্রপিক্যালে ভর্তি হলেন, চিকিৎসা চলল এটা ওটা, কারণ কোনও ডাক্তারই সঠিক রোগ নির্ণয় করতে পারলেন না। তাঁদের মতে, শারীরিক পরীক্ষা অনুযায়ী রোগীর শরীরে কোনও রোগ নেই। অথচ তাঁরাই দেখেছেন সময় সময় রোগীর আকস্মিক শারীরিক অবস্থার অবনতি। যাইহোক এইভাবে অনেকদিন কাটল। তারপর একসময় তিনি যখন কিছুটা মন্দের ভালো অবস্থায় এলেন

আমরা ফিরে এলাম স্বস্থানে শ্রীরামপুরে। এসময় তিনি চলাফেরা করতে পারছেন কিছুটা, খুব দুর্বল। শরীরের স্বাভাবিক সামর্থ্য নেই।

দীর্ঘ রোগভোগে তাঁর দেহমন একেবারে বিধ্বস্ত। সবকিছুতেই বিরক্তি, বিতৃষ্ণা আর বিশ্বাসহীনতা। মনটা শতচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত, বিভ্রান্ত। সামান্য কথাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ঠিক এইসময় আমার মা শুনলেন ঠাকুরের কথা। তিনি আসছেন হুগলি জেলার দিগসুই গ্রামে। আমার ছোট জ্যাঠাইমা, ছোট জ্যাঠামশাই ও তাঁদের ছেলে (শ্রীমান অশোক, আমার জ্যাঠতুত ভাই, আমার থেকে কিছু বড়, স্কুলের ছাত্র আমার মতো আর আমরা পরস্পর বন্ধুর মতো) পরদিন দিগসুই যাচ্ছেন। জ্যাঠামশাই ও জ্যাঠাইমা দীক্ষা নেবেন। মাও ব্যাকুল হলেন তাঁর দর্শন ও দীক্ষালাভের জন্য। তিনি শুনেছেন, সদ্‌গুরুর আশ্রিত হলে জীবনের বাধাবিপত্তি দুর্যোগ দূর হয়, কল্যাণ হয়, শান্তিলাভ হয়। তিনি বাবাকে চেপে ধরলেন আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাঁরও দীক্ষাগ্রহণের জন্য। এইভাবে না জেনেশুনে হঠাৎ দীক্ষা নেওয়ার বিরোধী বাবা। সুতরাং তিনি দীক্ষা নেবেন না, একথা তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন। আর দিগসুই যাওয়ার প্রশ্নই তো ওঠে না কারণ অসুস্থ বাবা বেশী হাঁটাচলা তখনও করতে পারেন না। এই ব্যাপারটা ছিল খুবই সত্যি কারণ বাবার হাঁটাচলা তখন খুবই সীমিত। মা কিন্তু দমলেন না। মার পীড়াপীড়িতে যেতে রাজি হলেন। দিগসুই ত্যালাণ্ডু রেল স্টেশন থেকে প্রায় মাইল চারেক দূর। পরদিন (১৫ জানুয়ারি ১৯৬০) ভোরবেলা যাত্রা করে আমরা ত্যালাণ্ডু এসে পৌঁছালাম। আমরা দুটি পরিবার, দলে মোট সাতজন, তার মধ্যে একজন অসুস্থ মানুষ আর একজন ছোট শিশু, আমার বছর ৪।৫-এর বোন। বোনকে আমরা দুইভাই কোলেপিঠে কাঁধে চাপিয়ে সকলে এগুলাম। বাবা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসতে আসতে হাঁটা শুরু করলেন। কি আশ্চর্য একসময় ধানক্ষেতের আলের ওপর দিয়ে এই পথ কোথাও না থেমে তিনি এসে পৌঁছালেন দিগসুই। এতটা পথ তিনি যে হেঁটে আসতে পারবেন তা আমরা ভাবতেই পারিনি! একেই বোধহয় বলে পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘন।

তখন বোধহয় সকাল দশটা সাড়ে দশটা হবে। একসময় দীক্ষার্থীদের শুদ্ধ কাপড় পরে দীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে কম্বলাসনে সারিবদ্ধভাবে বসতে বলা হল মাইকে। আর যা যা করতে হবে, যেমন 'গুরু' মন্ত্রজপ ইত্যাদি, বলা হল।

আমার মা সকলের সঙ্গে তৈরী হয়ে নিলেন, বাবাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে প্রস্তুত করালেন। বাবার আপত্তি কিন্তু এখন আর কেন জানি না, পূর্বের মতো তীব্র নয়। এখন কিছুটা যেন ইতস্তত ভাব। যাইহোক শেষপর্যন্ত মার কথায় রাজি হয়ে মার সঙ্গে দীক্ষাস্থানে যথাযথভাবে আসনে বসলেন।

'গুরু গুরু' জপ সকলের চলল। বাবাও চোখবন্ধ বসে নির্দিষ্ট করণীয় কাজ করে চলেছেন। আজ মানসচক্ষে সেদিনর ঘটনার পর্যালোচনা করে দেখছি আসনে বসার পর থেকেই বাবার মধ্যে একটা শান্তভাব এল। চোখবুজে জপ করে যাচ্ছেন স্থিরভাবে আর সকলের সঙ্গে। দীক্ষার্থীদের জপের সঙ্গে ঘুরে চলেছে ঘড়ির কাঁটা। সেই সকালবেলা বসেছেন সকলে। বেলা গড়িয়ে চলল প্রায়। মাঝে মাঝেই সমবেত দর্শনার্থীদের মধ্যে রব ওঠে, ঐ আসছেন, ঐ আসছেন বাবা। কিন্তু কোথায় কি! রব নীরব হয়। দর্শনার্থীদের মধ্যে ছোট দর্শনার্থী আমরাও দাঁড়িয়ে আছি দীক্ষাস্থল থেকে একটু দূরে, যেখান থেকে দীক্ষাস্থল ও আসনাসীন দীক্ষার্থীদের পরিষ্কার দেখা যায়। আমাদের চোখ মূলতঃ আমাদের মা বাবাদের দিকেই। এমন সময় ঐ রব-কলরবের মধ্যে সত্যি সত্যিই ঠাকুর এসে পড়লেন। শুভ্র কৌপিন, শুভ্র উত্তরীয়, তিলকমালা আর বক্ষে শ্রীগুরুপাদুকার 'রয়েল ড্রেসে'। দূর থেকে দ্রুতগতিতে লম্বিত চরণে শ্রীমুখে তাঁর ভুবনমোহন হাসি নিয়ে যেন দৌড়ে আসছেন দীক্ষাস্থলের দিকে। দর্শনার্থীদের মধ্যে আনন্দের কলকাকলি। বহুক্ষণ প্রতীক্ষান্তে দর্শনাকাঙ্ক্ষার উচ্ছ্বসিত বহিঃপ্রকাশ। ঠাকুর এবার সারিবদ্ধভাবে আসনাসীন দীক্ষার্থীদের মাথায় শ্রীগুরুপাদুকা স্পর্শ করতে করতে এগিয়ে আসছেন। এইসময় দেখি বাবা যেন আর নিজের মধ্যে নেই। এতক্ষণ চোখবুজে স্থির হয়ে আসনে বসে মা'র সঙ্গে জপ করছিলেন। এখন দেখি তাঁর শরীর

খুব কাঁপছে, চোখদুটি বন্ধ, তা থেকে নেমে আসছে শ্রাবণের ধারা, হাতদুটি বদ্ধাঞ্জলি অবস্থায় বুকের কাছে। কোনও কোনও সময়ে হাতদুটি চোখের ওপর উঠে এসে বদ্ধ চক্ষুকে ঢাকা দিয়েছে। ঠাকুর দূর থেকে দীক্ষার্থীদের মাথা স্পর্শ করতে করতে সারি অনুযায়ী এগুচ্ছেন আর বাবার অবস্থা দেখছেন। শ্রীমুখে যেন মৃদু-হাসির আভাস। একসময় বাবা শরীরের কম্পন আর ক্রমাগত অশ্রুধারায় আর বসে থাকতে পারলেন না, ভুলুণ্ঠিত হয়ে আসনের ওপর গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। বাবা বোধহয় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন মনে করে কেউ কেউ এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা দীক্ষাস্থল দেখাশুনায় ছিলেন তাঁরা চিৎকার করে নিষেধ করলেন—কেউ ওঁকে স্পর্শ করবেন না, উনি ঠিক আছেন। ইতিমধ্যে ঠাকুর সামনে এসে পড়েছেন। বাবাকে স্পর্শ করলেন, বাবার সঙ্গে সঙ্গে শান্তভাব ফিরে এলো। এসবই ঘটল খুব দ্রুত। এবার দীক্ষাও সম্পন্ন হল পরপর। বাবা যেন অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। সকালবেলা এসেছিলেন মুখেচোখে অসুস্থ কালিমা নিয়ে, রাতে ফিরে গেলেন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর একজন সুস্থসবল মানুষ হয়ে।

পরে বাবাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম দীক্ষার সময় তাঁর সেই অস্বাভাবিক শারীরিক অবস্থা বিষয়ে। তিনি বলেছিলেন জ্যোতির্মণ্ডলের মধ্যে দিব্যমূর্তিতে ঠাকুরকে আসতে দেখেছিলাম, তখন তাঁর শ্রীচরণ যেন ভূমিস্পর্শ করছিল না। আর ছিল একটা অনাস্বাদিত আনন্দানুভূতি যার প্লাবনে কোনও বাহ্যজ্ঞান ছিল না, দেহের ওপর কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। বাবা আমার ছিলেন স্বল্পভাষী। বারংবার জিজ্ঞাসায় তাঁর টুকরো টুকরো উত্তরে যেমন বুঝেছিলাম তেমন বিবৃত করলাম।

এরপর বাবার জীবনে যে আমূল পরিবর্তন এলো তার কথা পূর্বেই বলেছি। পরবর্তীকালে ঠাকুরের সঙ্গে বাবা-মার ঘনিষ্ট যোগাযোগ হতে লাগল। ওঁদের তিনি স্নেহ করতেন, কৃপাও করেছিলেন অনেক। বাবার সম্পর্কে ঠাকুর বলেছিলেন—'তোর পূর্বজন্মের সাধনা করা ছিল। কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়েছেন। কিন্তু অনুভূতির বহিঃস্ফূরণের জন্য ঠাকুর বাবাকে আহার সংযমের ওপর চাপ দিতে বলেছিলেন। এক বৎসর হবিষ্যও করান। ঠাকুর তাঁর সন্তানদের মধ্যে প্রয়োজনবোধে কাউকে কাউকে তিলকমালা দিতেন। এইরকম একসময়ে বাবাও ঠাকুরের কাছে তিলকমালা পাওয়ার ইচ্ছা জানালেন একবার। ঠাকুর মৃদু হেসে ওঁর কপালে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে টেনে দিয়ে বললেন—'তোর আছে, দরকার নেই।' বাবা-মার সঙ্গে বাংলার বাইরে কিছুদিন ঠাকুরের শ্রীচরণ সান্নিধ্যে থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল, বিশেষতঃ শ্রীপুরীধাম, বিঠুর শ্রীপুষ্করধামের আনন্দস্মৃতির কথা খুব মনে পড়ে। এসময় ঠাকুর আমাদের তিনজনকে দিয়েই বিভিন্ন কাজ করিয়ে নিতেন। পরে আমাকে দিয়েও কৃপা করে গুরু সেবামূলক অনেক কাজ করিয়েছেন। শ্রীব্রজনাথবাড়ীতে মেয়েদের বিবাহ ইত্যাদি কাজে তিনি মাকে পাঠাতেন ভাঁড়ারের দায়িত্ব দিয়ে। এতদিন পর বাড়ীর ছেলেদের হয়তো অবলুপ্ত হয়ে গেছে সেসব দিনের কথা। মাকে দিয়ে ঠাকুর শ্রীরামপুর, চাতরায় মায়েদের সতীসঙ্ঘ স্থাপন করিয়েছিলেন। মা পৃথিবীতে তাঁর কাজ শেষ করে শ্রীসীতারামলোকে চলে গেছেন অনেকদিন হল (১৯৮৮) কিন্তু ঠাকুরের সেই সতীসঙ্ঘ আজও ঠাকুরের কৃপায় চলছে বেশ ভালোভাবেই। আমার বাবা (নির্মলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়) গেলেন কিছুদিন পূর্বে (২০১৩) শতবর্ষ এখানে কাটিয়ে। ওসব অন্য প্রসঙ্গ।

বাবার কাছে মার কাছে জীবনে অনেক কিছু পেয়েছি। জীবনে হরিনামের প্রথমপাঠ মার কাছেই। তাঁদের জন্যই জীবনে এই যুগপুরুষ ঠাকুরের দর্শন, কৃপা ও স্নেহ ভালবাসা পেলাম। জীবনে ঠাকুরের অশেষ কৃপার কথা স্মরণ করলে, তাঁর লীলাচিন্তা করলে প্রথমেই মনে পড়ে আমার সেই মা-বাবার কথা যাঁদের কৃপালাভ আমার কৃপালাভের পথ সুগম করেছিল। যাঁর কৃপায় আমরা একসময় দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের আঁধার রাত পেরিয়ে আলোর প্রভাতে উদিত সূর্য্যকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে পেরেছি বাবা-মার সেই কৃপালাভ স্মরণ করেই তাঁরই শ্রীচরণে নিবেদন করলাম তাঁর লীলাকথা চিন্তনের প্রথম পুষ্পাঞ্জলি।

সংঘ সমাচার

শ্রীনামপ্রচার তথা ধর্মপ্রচার পরিক্রমায় সর্বাধীশজী

শ্রী সুব্রত রায় চৌধুরী

দিল্লীর সাঁইমন্দিরে

শ্রীভগবান ওঙ্কারনাথদেবের দিল্লীর অদ্বিতীয় লীলাস্থল মাতৃমন্দির (ময়ূর বিহার, ফেজ-১)। বহুদিন পর আজ আবার আনন্দে উত্তাল হল। যদিও বাহ্যতঃ প্রভু লীলা সংবরণ করেছেন তবুও সেই লীলাপুরুষের চিরন্তন লীলাবিলাস কি কোনওদিন স্তব্ধ হয়ে যাবে? সেই মধুরাতিমধুর লীলাভিরামের লীলার যেমন কোন শুরু নেই তেমনি তার কোন সমাপ্তিও নেই।

এই ভাগবতী লীলা শুধু চির পুরাতন নয়, নিত্যনতুনও বটে। তাই দেখা যাচ্ছে ইদানীং সংঘ-সর্বাধীশ কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজকে উপলক্ষ্য করে শ্রীশ্রীঠাকুর শুধু দিল্লী নয়, সমগ্র ভারতব্যাপী এক অভিনব লীলা লহর তুলেছেন। রাজধানী থেকেই শুরু করা যাক্। সর্বাধীশজী সাধারণতঃ নানা কারণে সম্প্রদায়ের বাইরে কোন অনুষ্ঠানে একেবারেই সময় দিতে পারেন না। এমনকি সম্প্রদায়ের একান্ত প্রয়োজনীয় ক্রিয়াকাণ্ড ছাড়া ওঙ্কার মঠের সাধনকুটীর ছাড়া অন্যত্র তেমন যেতেও পারেন না। কারণটি আমরা অনেকেই জানি। শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ণাঙ্গ জীবনী ও বাণী রচনার গভীর গবেষণামূলক কাজে তিনি উপস্থিত সর্বশক্তি নিযুক্ত করেছেন যেটি বলাবাহুল্য প্রভুর আর এক অনবদ্য লীলা-বিহার। যাক্ দিল্লী প্রসঙ্গে ফিরে আসি এবং তার অভিনবত্বের কথাই বলি। দিল্লী ময়ুর বিহার প্রভৃতি অঞ্চলের এক জনপ্রিয় সমাজসেবক তথা সাঁইভক্ত শ্রীযুক্ত সুরজিৎ সিং, কিংকর জয়ের মাধ্যমে সর্বাধীশজীর প্রবচন তথা সুমধুর ভজনের খ্যাতি শুনে বড় আগ্রহী হয়ে উঠলেন তাঁকে সাঁইমন্দিরে এনে সাঁইভজন তথা সনাতন ধর্ম বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আহ্বানে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই অন্তর প্রেরণায় মহারাজজীর এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন কারণ সদ্‌গুরু হিসাবে শ্রীশ্রীশিরডী সাঁইবাবা বিশ্বপ্রসিদ্ধ। তাই অপরাপর সনাতন ধর্মপ্রেমীদের মতো সর্বাধীশজীও শিরডী সাঁইবাবার প্রতি বিশেষভাবে শ্রদ্ধাশীল।

১৬ই এপ্রিল, সর্বাধীশজী তাঁর একান্তপ্রিয় স্থল শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু লীলাপূত দিল্লীর 'মাতৃমন্দিরে' এসে পৌছালেন। ১৭ই সকালেই স্থানীয় ময়ুর-বিহার সাঁইমন্দিরে তাঁর অভিনব অনুষ্ঠান। আমরা সকলেই গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি নতুন পরিবেশে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর মধ্যে দিয়ে কি অপরূপলীলা বিস্তারে আগ্রহী হন। সকাল ১০টা নাগাদ সুরম্য সাঁই মন্দিরের প্রশস্ত হলে মন্দিরের শ্রেষ্ঠ পরিচালক শ্রী সুরজিৎ সিং মহাশয় তাঁকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্বর্ধনা জানালেন। দিল্লীর বিশিষ্ট গুরুভ্রাতা, উত্তর রেলের অন্যতম ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার ভক্তোত্তম শ্রীযুক্ত প্রভাকর মিশ্র সুমার্জিতভাবে সভা পরিচালনা করলেন। শ্রী সুব্রত রায়চৌধুরী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে সংক্ষিপ্তভাবে বিঠ্ঠল রামানুজজীর জীবনী, শ্রী গুরুসেবার উৎকর্ষ তথা তাঁর বহুমুখী প্রতিভার কথা চিত্তাকর্ষকভাবে উপস্থাপিত করলেন। এক ফাঁকে প্রধান আয়োজন শ্রীযুক্ত সুরজিৎ সিং মহাশয়ও তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করলেন। এরপর শুরু হল সর্বাধীশজীর অশ্রুতপূর্ব সাঁইভজন এবং সনাতন ধর্মের এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ হিসাবে যুগপূজ্য শ্রীশ্রীশিরডীবাবার অবদান বিষয়ক প্রবচন। শ্রীশ্রী সাঁইবাবা বিষয়ক দিব্যভজন মহারাজজীর সুমধুর কণ্ঠে দিব্য-আবেশে সভাকক্ষে অমৃত বর্ষণ করল ঃ

তেরা দোয়ারা যিত্না ন্যারা (দুর্লভ)
হর মজহব (ধর্ম) কো উত্না হী প্যারা
ভেদভাবে নেহি দীনধর্ম মে
তেরা ইয়ে উপ্‌কার হ্যায় রে।...

জীবন হ্যায় মিট্টী কী গাগর
দুনিয়া হ্যায় এক গহেরা সাগর
লহরে উস্‌কী হ্যায় তুফানী
তু সবকা খেবন হাররে।।...

প্রথম স্তবকটি সহজবোধ্য। দ্বিতীয় স্তবকটির অন্তর্নিহিত অর্থ একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয় ঃ প্রত্যেক মানুষের জীবন হল সুগভীর সংসার-সমুদ্রে টল্‌টলায়মানভাবে ভাসমান একটি কলস। এই সংসার সমুদ্র বড়ই তরঙ্গ-উত্তাল। এই ভয়ঙ্কর তরঙ্গক্ষুব্ধ মহাসুমদ্রের মহাবিপদ হতে সবাকার ত্রাণকর্তা হলেন সাঁইরাম (তথা সীতারাম বা সদ্‌গুরু)।

প্রসঙ্গক্রমে বলা ভাল—ভজনের পুনঃ পুনঃ গীত ধুয়া হিসাবে মহারাজজী 'সাঁইরামে'র সঙ্গে 'সীতারাম' গান করে ভজনটিকে সার্বজনিক করে দেন। একই মঞ্চে আরও দুটি ভজনগান করে তিনি শ্রীশ্রীসাঁইবাবার সর্বজনপ্রিয় বাণীর সঙ্গে সর্বজনমান্য বেদবেদান্ত তথা শ্রীশ্রীগীতা ও শ্রীশ্রীচণ্ডী যুগ যুগ পূজিত বাণীর বিশেষ মিল প্রদর্শন করেন। তাই যথা ঃ

১) একং সদ্‌বিপ্রা বহুধা বদন্তি (ঋক্‌বেদ)
২) একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ।
৩) সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
(শ্রীশ্রীগীতা)
৪) একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
(শ্রীশ্রীচণ্ডী)
৫) শ্রীশ্রীসাঁইবাবার সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী ঃ সবকা মালিক এক।

বলাবাহুল্য শ্রীশ্রীসাঁইবাবার বহুশ্রুত বাণী **সবকা মালিক এক** যেন সনাতনশাস্ত্রের উপরোক্ত বাণীগুলিরও প্রতিধ্বনি। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এই যুগের সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুবাণীতে এই সারসত্য নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে, যার মধ্যে প্রসিদ্ধ হোল ঃ **সংসারের কর্তা শ্রীভগবান, আমরা তাঁর দাসদাসী** ইত্যাদি। এই সত্যবাণীর অনুসরণে মহারাজজী শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাজীবনের কিছু প্রাসঙ্গিক কথাও বর্ণনা করেন। সর্বশেষে হরিনাম তথা হরিনামের মহিমা গান করে সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয় ঃ

পীলে পীলে পীলে হরিনাম কী পেয়ালা
ইস্‌কো পীকর ঔর পীলাকর
তু বন্ জা মতোয়ালা, মতোয়ালা, মতোয়ালা...

হৃষীকেশ ও দেরাদুনে

মাতৃমন্দিরে কল্যাণীয়া সাবিত্রীদেবীর ব্যবস্থাপনায় উত্তম প্রসাদান্তে বেলা ১২টা নাগাদ হৃষীকেশ যাত্রা। দিল্লীর সেবকশ্রেষ্ঠ তরুণ দাস এবং রাণাভাই উত্তম গাড়ীর ব্যবস্থা করে রেখেছিল। বৃন্দাবন আশ্রমের মঠাধীশ কিংকর জগদানন্দজী এবং অপূর্বভাইকে সঙ্গে করে মহারাজজীর গাড়ী হৃষীকেশ আশ্রমে পৌঁছে গেল সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ। আশ্রমস্থ শ্রীগুরুমন্দির এবং শ্রীগঙ্গামন্দির প্রণামান্তে আশ্রমবাসীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের কিছু সময় গেল। আশ্রম সেবক সনৎভাই এবং চিরঞ্জীবভাই সপ্রেম মহারাজজীর কাছে প্রার্থনা রাখলেন পরদিন অন্নপ্রসাদ গ্রহণের জন্য। এরপর গাড়ি যাত্রা করলো বহু বিশিষ্ট মনীষী ও অপূর্ব ভক্তিধনে ধনী শ্রীমান্ রাজসুপেজী এবং তাঁর বন্ধুবর আর এক নবীন উত্তম সীতারাম-সেবক কিশোর রাও ভাইয়ের ঐকান্তিক প্রার্থনায় তাঁদেরই সদ্য প্রতিষ্ঠিত হৃষীকেশেরই বীরভদ্র অঞ্চলে বিশাল আশ্রমবাড়ী 'ব্রহ্মকমলে'র উদ্দেশে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অভিনব লীলা কিছুটা ধীরগতিতে হলেও কি বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করছে তার এক উৎকৃষ্ট প্রমাণ এই ভক্তযুগলের অনবদ্য শ্রীগুরুসেবা। শ্রীশ্রীঠাকুর তথা ঈশ্বরকেন্দ্রিক জীবনযাপনের জন্য এই তরুণ ভক্তযুগল মুম্বই ও ব্যাঙ্গালোরে বিশালক্ষেত্র ছেড়ে সুবিশাল হিমালয়ের পাদদেশে এসে গঙ্গাতীরের কিছুটা নির্জন প্রান্তে একান্ত বাস করছে। শিবসুন্দরের তথা সীতারাম সুন্দরের সুপ্রতিষ্ঠা করেছে এই সর্বাঙ্গসুন্দর আশ্রমপীঠে। ওঙ্কারেশ্বর মহাতীর্থ হতে কিশোরভাই বহন করে নিয়ে এসেছেন বৃহৎ এক শিবলিঙ্গ এবং তার বাহন নন্দীশ্বরকে। শিবমন্দিরের শিব যথাযোগ্যভাবে বিরাজ করছেন নিজ মহিমায়, অপরদিকে শ্রীগুরুমন্দিরে বিরাজ করছেন শ্রীশ্রীপরমগুরুদেবসহ শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব সুন্দর

তৈলচিত্র। আর এক প্রান্তে রয়েছে কিংকর বিশ্বশ্রেয়ানন্দজীর (অর্থাৎ সুপে ভাইয়ের) একান্ত ধ্যান কুটির। পশ্চাৎভাগে রয়েছে শ্রীমান্ কিশোর ভাইয়ের সপরিবার বাসস্থান যাকে বানপ্রস্থ আশ্রম বলাই সঙ্গত। পাশাপাশি রয়েছে দেবতাত্মা হিমালয়ের অরণ্যরাজি। সামনেই প্রবাহমানা কুলুকুলুনাদিনী সুরেশ্বরী গঙ্গা। 'তব তট নিকটে যস্য নিবাস খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাস'—এই উত্তম সীতারাম সেবকদ্বয় নিশ্চয় বৈকুণ্ঠবাসী।

শুধু বহিরঙ্গ দিক দিয়ে নয় অন্তরঙ্গ দৃষ্টিতেও এই ভক্ত-যুগল নিঃসন্দেহে বর্তমান যুগের পক্ষে একান্ত উপযুক্ত সুশিক্ষিত সুমার্জিত শ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুসেবক। তাই শুধু নিজেদের ধ্যানধারণা নিয়েই এরা ব্যতিব্যস্ত থাকে না, প্রায়ই চেষ্টিত থাকে সীতারামের ভাবধারা দেশে দেশে দশে দশে পৌঁছে দেবার জন্য। এমনই এক ধর্মানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল ১৮ই এপ্রিল গুড ফ্রাইডে-র পুণ্যলগ্নে বহুমাধুর্য্যমন্ডিত হিমালয় পরিশোভিত পরিবেশে। দিল্লী, মুম্বই, ব্যাঙ্গালোর, পাঞ্জাব, এমনকি হৃষীকেশ, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থান থেকেও ছুটে এসেছেন নবীন-প্রবীণ সুপ্রতিষ্ঠিত কিছু আধুনিকভক্ত যাঁরা সুপেভাইয়েরই উদ্যোগে সীতারাম ভাবগঙ্গায় স্নানার্থী। সর্বাধীশজী যথাকালে তাঁদের দীক্ষাদান ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরের অভয় অমৃত চরণে চির আশ্রয় লাভের ব্যবস্থা করলেন। আর এক পাশে একটি সুসজ্জিত হলে চল্‌ছিল নতুন যুগের এক শ্রেষ্ঠ সীতারাম-সেবিকা, সুগায়িকা শ্রীমতী গার্গীদিদির সুমধুর কণ্ঠে হরিনাম সংকীর্তন। তাঁকে কণ্ঠদানে তথা করতাল সহযোগে সহযোগিতা করছিলেন তাঁরই সুযোগ্য পতিদেবতা দেরাদুনের ONGC Compamy'-র সুপ্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিনীয়ার শ্রীমান্ সত্যব্রত ভট্টাচার্য্য। দীক্ষাদানের পর সেই প্রশস্ত কক্ষে কিংকর বিঠ্‌ঠল রামানুজজী তাঁর রাগাশ্রয়ী শৈলীতে আশাবরী রাগে হরিনাম সংকীর্তনে বুঝি হিমালয়ের ধ্যানভঙ্গ করলেন। তারপরই পুনরায় হরিনামের মধুবর্ষণ করলেন বৃন্দাবনের মধুদা অর্থাৎ কিংকর জগদানন্দজী। এরপর শুরু হল এই প্রচারপর্বের বড় আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান 'প্রশ্নোত্তর' পর্ব। শ্রীমান্ রাজ সুপেজী তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বেশ কয়েকটি তীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক প্রশ্নবাণ একে একে সর্বাধীশজীর দিকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে ক্ষেপণ করতে লাগলেন এক বিচিত্র কৌশলে। তিনি ছোট ছোট কাগজে বড় বড় ক'রে এক একটি প্রশ্ন লিখে রেখেছিলেন সুস্পষ্টভাবে। সেগুলি এবার একে একে তুলে ধরলেন একবার প্রবল আগ্রহী শ্রোতৃমণ্ডলীর দিকে, তারপর সিংহাসনে উপবিষ্ট মহারাজজীর দিকে। বলাবাহুল্য সকলের বোঝবার সুবিধার জন্যে তিনি নিজমুখেও প্রতিটি প্রশ্ন কয়েকবারই যুগপৎ বিনীত ও দৃপ্তভাবে উচ্চারণ করছিলেন। মনে হচ্ছিল যেন এক বীর যোদ্ধাদের রণশিক্ষাক্ষেত্রে সুনিপুণ অস্ত্র বিশারদ অর্জুন বহুদক্ষ অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যজীর দিকে বাছা বাছা অস্ত্র ছুঁড়ে দিচ্ছেন শ্রীগুরুর অতুলনীয় মহিমাকেই প্রকাশ করবার জন্য। মোটামুটি বারোটি প্রশ্নোত্তর স্বতন্ত্রভাবে সংরক্ষণযোগ্য ও প্রচারযোগ্য যা হতে আমরা শুধুমাত্র দু'একটি এখানে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি।

১) মাধব সেবার জন্য মানবসেবাই কি যথেষ্ট নয়? আলাদাভাবে ধর্মকর্মের কি প্রয়োজন আছে?

উত্তর ঃ মাধবই যে মানবরূপে লীলা করছেন এই উচ্চভবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্যে অতি অবশ্যই নিত্য জপ-ধ্যান, স্বাধ্যায়, তথা নাম-সংকীর্তন সাধনাদির একান্ত প্রয়োজন আছে। নতুবা ভিখারীবোধে মানুষের সেবা করায় হয়তো মানুষের কিছু উপকার হতে পারে। কিন্তু মানুষের অন্তর্দেবতা তথা নিজ অন্তর দেবতার প্রসন্নতা সুদূর পরাহত। 'যত্র জীব তত্র শিব' এই বোধে উপনীত হওয়া বহু সাধনার ফলেই সম্ভব।

২) উপযুক্ত গুরুকে চেন্‌বার উপায় কি?

উত্তর ঃ একমাত্র উপযুক্ত শিষ্যই উপযুক্ত গুরুকে ঠিক্ ঠিক্ চিনে নিতে পারে। শ্রীশ্রীগীতা তাই বলছেন ঃ

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংজিতেন্দ্রিয়ঃ।

বেদান্ত বলছেন ঃ

আশ্চর্যো বক্তা কুশলোস্য লব্ধাশ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানু শিষ্টঃ॥
(কঠোপনিষদ ১।২।৭)

অর্থাৎ সেই আত্মার উপদেষ্টা অতি বিরল এবং অনুভবকারীও সুনিপুণ, কেননা নিপুণ আচার্য কর্তৃক

উপদিষ্ট হয়ে বিরল কেউ কেউ মাত্রই তাঁকে জ্ঞাত হন।

এইরকম আরও কয়েকটি আধ্যাত্মিক প্রশ্নের মহারাজজী যে যথাযোগ্য সদুত্তর দিচ্ছিলেন তা যথাকালে আমরা প্রকাশ করবো। কিন্তু সেই পরিপূর্ণ সভাকক্ষে প্রায় একশত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে উত্তর শ্রবণে যে হর্ষধ্বনি ঘনঘন শ্রুত হচ্ছিল, একইসঙ্গে মাঝেমধ্যেই মহারাজের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায় তথা চটুল উত্তর যে নির্মল হাস্যধ্বনিতে সভাকক্ষ উচ্চকিত হচ্ছিল তা প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই অনুভব করেছেন। সবটা ভিডিও-তে ধরে রাখতে না পারলেও অনেকটাই মোবাইলে বিধৃত আছে। সেটিও সুবিধা হ'লে সিডি-তে রূপান্তরিত ক'রে ভক্ত সাধারণের জন্যে প্রচার করা—আমাদের ইতি কর্তব্য ব'লে মনে করি।

পরবর্তী অনুষ্ঠান হিমালয়ের আর এক সুবিখ্যাত নগরী দেরাদুনের ONGC বিশাল চত্বরে। পূর্বোক্ত ভক্ত-দম্পতি শ্রীমান্ দেবব্রত ও শ্রীমতী গার্গী ভট্টাচার্য্যের ব্যাকুল প্রার্থনায় অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যেও আমরা কম সময়ের জন্য হলেও দেরাদুনের একটি সুন্দর ধর্মসভা আয়োজন করতে নির্দেশ দিয়েছিলাম। কিন্তু তার আগে মুনি-কি-রেতির হৃষীকেশ আশ্রমের সনৎভাই ও চিরঞ্জীব ভাইয়ের উত্তম আতিথ্য তথা প্রসাদদানের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। প্রসাদপর্ব সেরে সর্বাধীশজী যখন দেরাদুনে পৌঁছালেন, তখন গার্গীদিদির হলঘর কানায় কানায় পূর্ণ। ছোট-বড় সকলের অত্যাগ্রহী উপস্থিতিতে, শঙ্খধ্বনি তথা উলুধ্বনিতে, মাল্যদানে তথা পূজারতিতে মহারাজজীর স্বাগত সম্বর্ধনা তাঁদের অন্তরের উল্লাসকে বুঝি কিছুমাত্র প্রকাশিত করতে পেরেছে যেখানে সীতারাম সেখানেই হরিনাম, হরিনামের আয়োজনেই সীতারামের শ্রেষ্ঠ পূজা উপচার। তাই এক শ্রেষ্ঠ গায়িকা যিনি কিছুদিন আগেই দিল্লী দূরদর্শনে National Channel এ তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনার দ্বারা সহস্র সহস্র শ্রোতাকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিলেন, সীতারামের অশেষ করুণাধন্য সেই গার্গীদিদি তাঁর নিজস্ব মহল্লায় বহু মানুষকে অপূর্ব হরিনাম সংকীর্তনে নিমেষে মুগ্ধ করবেন না কেন? এরপর মহারাজজীর পালা। খুবই আশ্চর্যের বিষয় তিনি যেখানেই যাচ্ছেন সেখানকার সব অনুষ্ঠানে সার্বিকভাবে সাফল্যমণ্ডিত হচ্ছে। দেরাদুনেও একইসঙ্গে বাগ্মিতা ও সঙ্গীতপ্রতিভার যুগল সম্মেলনে তাঁর অনুষ্ঠান এককথায় সর্বাঙ্গসুন্দর। এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সকলের চিত্ত হরণ করে নিলেন। দেরাদুনের অনুষ্ঠানের এক প্রধান আকর্ষণ কিন্তু টিহেরী গাড়োয়ালের মহামাননীয়া 'রাণীমা' মাল্যা রাজলক্ষ্মীজীর মহাগৌরবময় উপস্থিতি এবং আসন্ন নির্বাচন উপলক্ষে মহারাজজীর নিকট হতে বিশেষ আশীর্বাদ গ্রহণ। নির্বাচনী ট্যুরে অতি ব্যস্ততার মধ্যেও মহারাজজী সকাশে তাঁর শুভাগমন, ভক্তিভরে প্রণতি জ্ঞাপন এবং আশীর্বাদ গ্রহণ নিঃসন্দেহে তাঁর সীতারাম ভক্তির এক উত্তম-নিদর্শন। সভান্তে সমবেত ভক্তবৃন্দের 'পুনরাগমনায় চ' এই ব্যাকুল প্রার্থনার মধ্যে সসঙ্গী মহারাজজী সন্ধ্যাকালে দিল্লী যাত্রা করলেন। এই যাত্রাকালে ভক্ত দম্পতির শ্রীযুক্ত এবং শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য তাঁর সঙ্গী হলেন দিল্লীর আসন্ন উৎসবে সামিল হবার জন্য।

পুনরায় রাজধানীতে ঃ মন্দিরে মন্দিরে উত্তাল নামকীর্তন, ভজন ও প্রবচন

দিল্লী ময়ূর-বিহার ফেজ্-১এ বহু পরিচিত মাতৃমন্দিরের পাশেই সুবিখ্যাত গোশালী শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দির। এই কলিকবলিত যুগে বিলাস-ব্যসনের রাজধানী দিল্লীর বুকে একটি প্রশস্ত মন্দির প্রাঙ্গনে নিত্য বহু গোমাতার সেবাপূজা চলছে। বড় সমাদরের সঙ্গে এটি এক বড় গৌরবের বিষয়। যে শ্রীকৃষ্ণ 'গোব্রাহ্মণ হিতায়চ' ব'লে চিরপূজিত হচ্ছেন তাঁর মন্দিরে প্রবেশের আগেই এইরূপ গো-সেবার আয়োজন নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং শোভাবর্দ্ধনকারী। স্থানীয় মন্দিরের মোহন্ত মহারাজ মঙ্গলদাসজী পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে মহারাজজীকে বরণ ক'রে নিলেন, মহারাজজীও তাঁকে একটি উত্তম চাদর জড়িয়ে দিয়ে প্রেমাবেশে আলিঙ্গনবদ্ধ করলেন। তারপর শুরু হল সভাপর্ব কিংকর জয়ের (সুব্রত রায়চৌধুরী) উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে। সুকণ্ঠী গার্গী ভট্টাচার্য্যের 'মন মে রাম, তন্ মে রাম, রোম রোম মে রাম রে' এই ভক্তিগীতি সঙ্গত কারণেই এক শ্রেষ্ঠ আবহ সঙ্গীতের সূচনা করলো।

মঙ্গলদাসজীসহ বাকী ভক্তবৃন্দ অভিভূত। তারপর শুরু হলো সর্বাধীশজীর সুমধুর ভাষণ। আজকে তাঁর বক্তব্যের মুখ্য বিষয় ছিল সৎসঙ্গের অমৃত প্রভাব। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুশ্রুত মঙ্গলাচরণ থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা করলেন ঃ

নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়য়েন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

প্রভৃতি শ্রীমদ্ ভাগবত বাক্য উদ্ধৃত করলেন 'মানস মরাল' তুলসীদাসজীর সুপ্রসিদ্ধ সৎসঙ্গ স্তুতি ঃ

বিনু সৎসঙ্গ বিবেক ন হোই।
রামকৃপা বিনু সুলভ ন হোই॥

তারপর শুরু হল তাঁর সুমধুর ভক্তিগীতি এবং ভক্তিগীতির সুরেই কলিকলুষহারী হরিনাম সংকীর্তন।

সন্ধ্যাকালে দিল্লী সফ্‌দরজঙ্গ Enclave এ বিখ্যাত কালীমন্দির 'মাতৃমন্দির' বড় সুন্দর অনুষ্ঠান। স্বনামধন্য শিল্পী গার্গী ভট্টাচার্য্য উদ্বোধনী সঙ্গীত গান করেন। তারপর অনুষ্ঠানের অন্যতম আয়োজক দিল্লীবাসী ভক্তপ্রবর ডাঃ লাহিড়ীর একান্ত অনুরোধে মহারাজজী এদিনের বক্তব্য মূলতঃ নাম-মহিমার উপরই সীমাবদ্ধ রাখেন। তারপর যেহেতু কালীমন্দির সেহেতু স্থান-মাহাত্ম্যকে গুরুত্ব দিয়ে মহারাজজী তিনটি অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীতে, শাস্ত্রীয় রাগরাগিণীর সমন্বয়ে এক অশ্রুতপূর্ব মাতৃভক্তি মণ্ডিত পরিবেশের সৃষ্টি করেন। সমবেত ভক্তগণ তথা মন্দির কমিটির সদস্যগণ পরম আনন্দে বিভোর হয়ে যান। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ করুণাধন্যা শিষ্যা সংঘ পরিচালিকা শ্রীমতী সুমিতা ঠাকুর এবং শ্রীমতী লাহিড়ীদিদিসহ বাকী ভক্তগণ মহারাজজীর প্রশংসায় পুনঃপুনঃ মুখর হন। সঙ্গীতগুলির মধ্যে ছিল-

১) দেবার মত অবিরত আছে শুধু চোখের জল
জানাই তোরে ওমা শ্যামা আর যা আছে সবই গরল॥
২) পূজিব তোমারে শ্যামা মানস কুসুমদলে।
সাড়া কি দিবে না শ্যামা এ দীনের নয়ন জলে॥

সবচেয়ে বেশী উপভোগ্য হয় কথামৃত বর্ণিত স্বামী বিবেকানন্দ গীত শঙ্করারাগে সেই বহু প্রসিদ্ধ গানটি ঃ

আপনাতে মন আপনি থাকো যেও না মন কারও ঘরে।
যা চাইবে তা বসেই পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।।...

সামনেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মন্দির থাকায় এবং বেশ কিছু রামকৃষ্ণভক্ত সভাতে উপস্থিত থাকায় সকলেই পরমানন্দে আপ্লুত হয়। সীতারাম ভক্তেরা অধিকতর খুশী হন যখন মহারাজজী তাঁর নিজস্ব শৈলীতে সেই একই শঙ্করারাগে হরিনাম সংকীর্তনের উচ্চরোলে দিক্‌বিদিক্ মুখরিত ও মধুময় করে দেন।

পরদিন অর্থাৎ ২০শে এপ্রিল পাণ্ডবনগর কালীবাড়ীতে নিঃসন্দেহে এইবারকার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাঙ্গসুন্দর অনুষ্ঠান। এই সাফল্যের জন্য অতি অবশ্যই কালীমন্দিরের বহুকালের শ্রেষ্ঠ পুরোহিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাচীন শিষ্য-সেবক শ্রী তপন মুখোপাধ্যায়ের সার্বিক প্রচেষ্টা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তপনদা শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারাতেই নিষ্ণাত, তাই মহারাজজীর উপস্থিতির পূর্বেই স্থানীয় নামকারীদের একটি বড় দলকে আমন্ত্রণ ক'রে এনেছিলেন এবং হরিনামের উত্তম আসর বসিয়ে দিয়েছিলেন। প্রণামান্তে প্রাথমিক পর্ব সেরে মহারাজজী তপনদা কর্তৃক আহত হয়ে উঠে গেলেন মন্দিরের দোতলার হলঘরে, সেখানে প্রায় ৩০জন দীক্ষার্থী দীক্ষালাভের উদ্দেশ্যে মহারাজজীর আসার প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে উপবিষ্ট আছেন। এই বিরাট হলের আর একপ্রান্তে চলেছে ভক্তগণের জন্য ভোগ-রন্ধনের বিশাল ব্যবস্থা। সুরভিত ধূপের সঙ্গে দূরাগত পাঁচফোড়নের তীব্র ঝাঁঝ উপবিষ্ট ভক্তগণকে মাঝেমধ্যে বিচলিত করছিল এবং অনিবার্য অশ্রুপাতেও তাদের বাধ্য করছিল বটে তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই সমস্যা মিটে যায়, এবং মহারাজজীর আগমন মাত্র দীক্ষার্থীগণ নিশ্চিন্ত আনন্দে অভিভূত হন। দিল্লীর বিভিন্ন মন্দির হতে বেশ কয়েকজন বাঙালি পুরোহিতও শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রয় লাভের জন্য ভক্তিভরে প্রতীক্ষারত থাকেন। মহারাজজী শ্রীশ্রীঠাকুরের নিয়মেই যথাশক্তি মন্ত্রদানে অগ্রণী হন, পুরোহিত তপনদাও তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করতে থাকেন। দীক্ষাপর্ব সমাপ্ত হলে শুরু হয় সভাপর্ব। নীচের বিরাট হল প্রায় তিনশতাধিক ভক্তে পরিপূর্ণ। উদ্বোধনী ভাষণে কিংকর জয়, কিংকর বিঠ্‌ঠল রামানুজজীর সাধন ও স্বাধ্যায় মণ্ডিত জীবনের ভূয়সী প্রশংসা করে তাঁর অনন্য

শ্রীগুরুসেবার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মহারাজজী তাঁর ভাষণে শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাজীবনী ও বাণীর প্রতি যথেষ্ট আলোকপাত করেন। শ্রীযুক্ত তপনদা তাঁর জীবনে শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভ বিষয়ে তাঁর বিচিত্র অনুভবের কথা প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করেন। অবশেষে মহারাজজীর ভজন ও নাম-কীর্তনের মধ্যে সভাকার্য সুসম্পন্ন করেন। যেমন অন্যত্র তেমনি পাণ্ডবনগর কালীবাড়ীতেও মহারাজজীর ভজন সমগ্র শ্রোতৃমণ্ডলীকে এক অন্যলোকে নিয়ে উপনীত করে, যে পরমানন্দলোক থেকে মানুষ সহজে নেমে আসতে পারে না। যদিও নেমে আসতে তারা বাধ্য হয়, তবুও অন্তরে আকুলতা থাকে কবে আবার সেই দেশে জগতের সব দুঃখ ভুলে পৌঁছানো যাবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনবদ্য কাব্যময় ভাষায়ঃ

আহা বেশ আহা বেশ বেশ বেশ বেশ
আনন্দ আনন্দ এ যে আনন্দের দেশ!
আনন্দ আনন্দ এ যে আনন্দ অপার
আনন্দ আনন্দ এ যে আনন্দ পাথার।...

(মহারসায়ন)

এদিন কেমন ক'রে এই আনন্দের দেশে শ্রোতৃমণ্ডলী পৌঁছে গেল তার একটু শেষ খবর দেওয়া যাক্। যেমন তিনি সাধারণতঃ করেন, মহারাজজী কথায় কথায় গানে গানে শ্রোতাগণকে ধীরে ধীরে অন্যলোকে নিয়ে যান। একনাগাড়ে ভাষণ হলে চঞ্চলমন সেই চাপ নিতে পারে না। তাই ভক্তিমূলক গীতির মাঝেমধ্যে একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তা আবার শাস্ত্রীয় (classical) রাগরাগিণীতে মহারাজজী যেভাবে প্রায়ই সুরের জাল বোনেন, তাতে অতিচঞ্চল মানুষও নিমেষে শান্ত হয়ে যায়, একাগ্র হয়ে যায়। তাই এই সঙ্গীতও সাধনজগতে এক পরম সহায়। কালীমন্দিরে স্থান-মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করে তিনি যে গানটি অবশেষে গাইলেন, তার রচনাকারও উচ্চকোটি সাধক সন্দেহ নেই।

মা মা বলে তাল দিতে দিতে মাতাল চলেছে
পথের ধারে বেতাল যত ভিরমি খেয়েছে।

নেশার মধ্যে সেরা নেশা মা মা বলে মা'তে মেশা।

সকাল বিকাল সন্ধ্যা হ'লে টলমল করেছে!...

কথায় কথায় গানে গানে নামে নামে মধ্যাহ্ন বেলা পেরিয়ে তপনদার মাতৃ-প্রসাদ বিতরণের আয়োজন সুসম্পন্ন। এদিকে ময়ূরবিহার মাতৃমন্দিরে প্রভুর বিশেষ ভোগের আজ সুব্যবস্থা আছে। বেশ কিছু ভক্তজন সেই মহাপ্রসাদ লাভের আশায় মাতৃমন্দিরে সমবেত হয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রাচীন ধারাকে অনুসরণ ক'রে কিছুটা বেলাতেই প্রায় ৩টা নাগাদ মহারাজজী সসঙ্গী মাতৃমন্দিরে পৌঁছালেন। মাতৃমন্দিরের সনাতন ধারাকে অনুসরণ ক'রে পরম পূজনীয়া মাতৃদেবী বীণামার হাতে তৈরী বর্তমানের গৃহলক্ষ্মী কল্যাণীয়া সাবিত্রীদেবীও বহুবিধ ভোগসম্ভার শ্রীশ্রীঠাকুরকে নিবেদন ক'রে অতিথি নারায়ণদের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলবাবে পথ দেখছেন। অতিথিগণসহ মহারাজজী অপূর্ব প্রসাদ গ্রহণে পরম তৃপ্ত হয়ে মাতৃমন্দিরের নীচে নির্দিষ্ট সর্বপ্রকার সুবিধাযুক্ত বিশ্রামগৃহে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন।

বিকাল ৪টা হতে না হতেই দিল্লীর সরস্বতীকুঞ্জের দেবদূত স্বনামধন্য বিজ্ঞানী সংঘের গৌরব ডঃ সীতাংশু শেখর লাহিড়ী এসে পৌঁছে গেলেন। ময়ূর বিহারে তাঁর গৃহে পদার্পণমাত্র সমবেত মাতৃমণ্ডলী উদ্বেল হলেন। গৃহকর্ত্রী শ্রীমতী জয়শ্রীদিদি অল্পসময়ের মধ্যেই এক অপূর্ব আয়োজন ক'রে রেখেছেন—হরিনাম সংকীর্তনের, ভজনের ও প্রসাদ ভোজনের। গার্গীদিদির কণ্ঠ আবার মধুবর্ষণ করলো। মহারাজজী প্রায়ই বলেন সকাল-সন্ধ্যা দুটো শিফ্‌ট কোনরকমে টান্‌তে পারি। তার বেশী চাপ দেহ-মন আর নিতে পারে না। তাই গার্গীদিদি Fill up the blanks যেভাবে করছেন তার মাধুর্য্য সত্যিকারেই অতুলনীয়। মাঝপথে আর এক ভক্তশ্রেষ্ঠের নিবাস। মহারাজজীর গাড়ীকে আরও দুটি ভর্তি গাড়ী অনুসরণ করছে। মহারাজজী যাচ্ছেন পট্‌পরগঞ্জের এক্‌তা গার্ডেনের শ্রীমান তরুণ দাসের বাসভবনে। তরুণের সঙ্গে রয়েছেন তাঁরই অভিন্নহৃদয় বন্ধু এক শ্রেষ্ঠশিল্পী তথা শ্রেষ্ঠ সীতারাম-অনুরাগী শ্রীমান্ অনিরুদ্ধ মুখোপাধ্যায়। শ্রীমান তরুণভাই এবং শ্রীমান অনিরুদ্ধভাই দুইজনেই দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীঠাকুরের নানাবিধ সেবায় যুক্ত। কেবলমাত্র

তাই নয়, তাঁরা উত্তম-সাধকও বটে। তাই মহারাজজী বললেন, 'where there is a demand there is a supply' অর্থাৎ যেখানে ঠিক ঠিক চাহিদা আছে, যোগানটিও সেখানে অনুরূপভাবে এসে যায়। শ্রীমান তরুণ ভাইয়ের সুসজ্জিত দেওয়াল-গাত্রে ভারী সুন্দরভাবে সাজানো শুধু শ্রীশ্রীঠাকুরের বিবিধ সমাধি অবস্থার ছবি। তার সাধনকক্ষটিও যেন একটি গুহাবিশেষ। গৃহকর্তার গৃহের এই বহিঃরঙ্গ ছবিটি দেখলেই তার অন্তরঙ্গ ছবিটির আভাস পাওয়া যায়। তাই গৃহকর্তার অন্তর্মুখী ভাবের মর্যাদা দিয়ে সর্বাধীশজী সহসা সাধন-জগতের অনেক উচ্চকোটির অবস্থা বর্ণনা দিতে লাগলেন পুরোপুরি অকল্পিতভাবে। কুণ্ডলিনী জাগরণ থেকে শুরু ক'রে যোগের নানা অবস্থা তথা সমাধি অবস্থার কথা তিনি শ্রীগুরুকৃপালব্ধ জ্ঞানসহায়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন। বলাবাহুল্য শ্রীশ্রীঠাকুরের নানাপ্রকার অপূর্ব সমাধি অবস্থা চিত্রদর্শনেই তিনি দিব্যভাবে ভাবিত হয়ে এই ভাবে মুখ খুললেন।

পরবর্তী সভাস্থল পটপরগঞ্জ সরস্বতীকুঞ্জে নিকুঞ্জবাসিনী এক শ্রেষ্ঠ সীতারাম-সেবিকা তথা সাধিকা শ্রীমতী সুমিতা ঠাকুরের গৃহস্বাশ্রমে। সত্যি কথা বলতে সরস্বতীকুঞ্জের এই গৃহকে গৃহস্থাশ্রম বলা মোটেই অতিশয়োক্তি নয়। কারণ শ্রীমতী ঠাকুর দিদির গৃহে নিত্য নামসংকীর্তন, সাপ্তাহিক সংঘের অধিবেশন তথা প্রায়ই নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান লেগেই থাকে। তাঁর সুযোগ্য পতিদেবতা ভক্তবর শ্রীযুক্ত আশীষ ঠাকুর উপস্থিত রাজধানী পরিত্যাগ করে হিমালয়ের কোলে উত্তরকাশী ভাগীরথী মঠের সংগঠন কার্যে সেবারতা তাই স্বগৃহে অনুপস্থিত। এই ঠাকুর পরিবারের দুই পুত্রই প্রতিষ্ঠিত ও দীক্ষিত কিন্তু কর্ম উপলক্ষ্যে তারা উপস্থিত দিল্লীর বাইরে। তাদের স্থান কিছুটা পূরণ করছেন নবদীক্ষিত এক অগ্রগণ্য সীতারাম-সেবক শ্রীমান্ রোহিত সরকার। বলাবাহুল্য শ্রীমতী ঠাকুর দিদির গৃহে তাঁরই ঐকান্তিক আহ্বানে বৈঠকখানায় উপস্থিত হয়েছেন অধিকাংশ বয়োঃবৃদ্ধ-বৃদ্ধা ভক্তগণ। যাঁরা শুধু বয়সের মাপকাঠিতেই বড় নয়, ভক্তিধনেও ধনী এবং অধিকাংশই ঠাকুর-দিদির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একান্ত প্রেমী। তাঁদের মধ্যেই উপস্থিত হয়েছেন এক বিশিষ্ট সীতারাম-সেবক ডাঃ অমরনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ধর্মপত্নী বিদুষী সীতারাম কন্যা...।

নিত্যনামকারীদের অনেকেই যথাসাধ্য সহযোগিতা করছিলেন যথা- বিশিষ্ট সীতারামভক্ত শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় তাঁর ধর্মপত্নীসহ। গার্গীদিদি এবং তার পতিদেবতা আজ রাত্রি ট্রেনেই তাদের স্বধাম দেরাদুনের বাড়ীতে চলে যাবেন, তাই আজ এই রাত্রির অনুষ্ঠানে তাঁর শেষের গানটিও নামটি শুনিয়ে গিয়ে এক স্বপ্ন সম্ভব সীতারামস্মৃতি সবার অন্তরে জাগিয়ে গেলেন। সবশেষে কিংকর বিঠ্ঠল রামানুজজীও তাঁরা নামে গানে ও প্রশ্নোত্তরে এক নব অনুরাগে সকলের অন্তরকে সীতারামের রঙে রঞ্জিত ক'রে দিলেন। শুধু নাম গানে নয় অমৃত তুল্য প্রসাদদানে তথা মধুরাতিমধুর আদর আপ্যায়নের রাজধানী দিল্লীর বুকে সীতারাম ভাবসিদ্ধ ভক্তিরাণী ঠাকুরদিদি কিভাবে যে শ্রীগুরুর সেবারতা তারও একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা পেলাম। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট সীতারাম সেবক ডাঃ লাহিড়ীর সু-চিন্তিত মন্তব্য ঃ বিঠ্ঠল মহারাজ এবার ওঙ্কারেশ্বর ওঙ্কার মঠ থেকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূর্ণশক্তি নিয়ে যেন অবতরণ করেছেন। এইভাবে তিনি ইদানীংকালে দিল্লীর জন্য এমন করুণাধারা আগে কখনও বর্ষণ করেন নি— নামে, গানে, প্রেমে ও প্রবচনে।

গুরুগাঁওয়ে পানোয়ার ভবনে

ঠাকুর দিদির কল্যাণে বহুবিধ প্রসাদ লাভ ক'রে মহারাজজী এগিয়ে চললেন পাশাপাশি এলাকা গুরুগাঁও এর দিকে। এই প্রসঙ্গে বলা খুবই প্রয়োজন শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর একান্তপ্রিয় শিষ্য-সেবক কর্ণেল পানওয়ারজীকে সপ্রেম নামকরণ করেছিলেন তাঁর গুরুভক্তির নিদর্শন হিসাবে—'কিংকর গুরুদাসজী'। কিংকর গুরুদাসজী শ্রীশ্রীঠাকুরের গ্রন্থটি হিন্দী ও ইংরাজীতে প্রচারের একসময়ে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁরই সুযোগ্য কনিষ্ঠপুত্র উপস্থিত দিল্লী জয়গুরু সম্প্রদায়ের সভাপতি এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ধর্মীয় কর্মধারাকে প্রচার প্রসারে একান্ত

উৎসাহী। তাঁরই উপযুক্ত পুত্র শ্রীমান্ শিবরাজ পানওয়ার এবং কন্যা শ্রীমতী শিবানী পানওয়ার ও প্রীতি পানওয়ার শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা প্রচারে একান্ত আগ্রহী। কর্ণেল পানওয়ারজীর জ্যেষ্ঠপুত্র ডাঃ কর্ণেল পানওয়ারও একজন বিশিষ্ট সীতারাম সেবক যিনি সাধারণতঃ নানা সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে লোকসেবায় উৎসর্গীকৃত। সব থেকে আনন্দের বিষয় উপস্থিত গুরুগাঁওবাসী, পানওয়ারজী পুত্র-কন্যাসহ ইদানিং বর্তমান সর্বাধীশ বিঠ্ঠল রামানুজজীর মাধ্যমে গুরুগাঁও-এ এক সুন্দর ধর্মানুষ্ঠান করবার উদ্দেশ্যে সরস্বতীকুঞ্জের ঠাকুরবাড়ী হতেই সসঙ্গী মহারাজজীকেই নিয়ে চললেন গুরুগাঁও-এ তাঁদের অধুনাতন নিবাসস্থলের দিকে।

পরদিন সকাল না হতেই পানওয়ার পরিবারের উদ্যোগে শ্রীমান্ ননীগোপাল ভাইয়ের পরিচালনায় একটি ক্ষুদ্র নামকীর্তনের দল পনওয়ার নিবাসকে নামের উচ্চবোলে মুখরিত করে দিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ত্যাগ-সেবক বর্তমানে বৃন্দাবন আশ্রমের অধ্যক্ষ কিংকর জগদানন্দজী শ্রীনামে তথা ভোগরন্ধনে নানাবিধ জোগাড় যোগাড় যন্ত্রে কর্মমুখর রইলেন। বিঠ্ঠল মহারাজজী কখনও শ্রীনামকীর্তনের মধ্যে কখনও বা সমাগত ভক্তদের সঙ্গে ধর্মকথায় ব্যাপৃত রইলেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত হলেন প্রতিবেশীদের মধ্যে কর্ণেল জোশী, ব্রিগেডীয়র মহেন্দ্র সিং, বিকালে সুবিখ্যাত সীতারামশিষ্য জেনারেল সুশীলকুমার। বেশ কয়েকজন মন্ত্রদীক্ষাও গ্রহণ করলেন যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য I.I.M.T. Oxford Brookes University-র অধ্যাপিকা ড. রুমকি বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কয়েকজন প্রাচীন-শিষ্যা বিশিষ্ট পরিবারের বিম্‌লা ঠাকরাণী, রামপেয়ারী ঠাকরাণী প্রভৃতি মহারাজজীর কাছে গুরুগায়ত্রী ও ইষ্টগায়ত্রী সংশোধন ক'রে নিলেন। জেনারেল সুশীলকুমার ও তাঁর পুত্র অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের বিশাল কল্যাণকর্মের কথা শুনে পরম আনন্দ প্রকাশ করলেন। স্থানীয় এক প্রতিনিধির সঙ্গে সনাতন ধর্ম বিষয়ে বিচার বিতর্কে সর্বাধীশজী ও পানওয়ারজী প্রায় সিংহমূর্তি ধারণ করে প্রতিপক্ষকে অভিভূত ক'রে দিতেন। প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর তথা অন্যান্য মহাপুরুষেরা এবং আজ আপনারা এত ধর্মপ্রচার করা সত্ত্বেও দেশে এত ব্যাভিচার কেন? অন্যায় অত্যাচার কেন? চোরাকারবারীদের এত রমরমা কেন? সর্বাধীশজী শান্তকণ্ঠে তাঁকে জানালেন —সনাতন ধর্মের প্রবক্তাদের মতানুসারে সত্যযুগে ধর্মের চারপাদই অবিকৃত থাকে। ত্রেতাতে তিনপাদ ধর্ম, একপাদ অধর্ম, দ্বাপরে দুইপাদ ধর্ম, দুইপাদ অধর্ম এবং কলিতে একপাদ মাত্র ধর্ম, তিনপাদই অধর্ম। সুতরাং এই ঘোর কলিকালে জগতে ধর্মের অবক্ষয় এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হবে—ভারতের মুনি-ঋষিদের এই ভবিষ্যৎবাণী। তবুও শ্রীভগবান যুগে যুগে আবির্ভূত হন, সনাতন ধর্মকে পুনরায় সংস্থাপন করবার জন্য। শ্রীভগবান তথা ভগবদ্‌দ্রষ্টা মহাপুরুষেরা যদি আবির্ভূত না হতেন, তাহলে যেটুকু ধর্ম তখনও দেখছেন আসুরিক প্রভাবে তাও অবলুপ্ত হয়ে যেত। অবতার পুরুষেরা মহাপুরুষেরা কিভাবে ধর্ম রক্ষা করছেন এই প্রশ্নের উত্তরে মহারাজজী বলেন তাঁরা নিজেরা আদর্শ ধর্মজীবন যাপন ক'রে, একইসঙ্গে নিরন্তর লোকশিক্ষার দ্বারা ধর্মরক্ষা করছেন। দ্বিতীয়তঃ কলিযুগে একমাত্র শ্রীভগবানের নামকীর্তনই পাপতাপ হতে মুক্তি তথা পরমশান্তিলাভর সহজ সরল উপায়। তাই তিন অবতারপুরুষই—শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং শ্রীশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথ নাম সাধনাকে কলিযুগের শ্রেষ্ঠ সাধনা বলে প্রচার করেছেন। তাঁদেরই প্রদর্শিত মার্গ অনুসারে আমরা যথাশক্তি হরিনাম সংকীর্তন করে থাকি এবং নাম আশ্রমের কথাই বলে থাকি।...

এইভাবে শ্রীনামকীর্তন তথা নাম-মহিমা গান করে গুরুগাঁওয়ের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। পানওয়ারজী তথা প্রীতিদিদি হরিনাম বিতরণের সাথে সাথে উত্তম প্রসাদ বিতরণেরও সুব্যবস্থা করেন। তারপর মহারাজজী বিকালের দিকে পুরীধামে 'যা যা নাম দিগে যা' অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ভুবনেশ্বরের দিকে যাত্রা শুরু করেন।

ভুবনেশ্বর শ্যামাশঙ্কর মঠে

২২শে এপ্রিল, ভুবনেশ্বরে শ্রীশ্রীশ্যামাশঙ্কর মঠে 'যা যা নাম দিগে যা' অনুষ্ঠানে যথাসাধ্য আয়োজন করেছেন মঠের প্রাণপুরুষ অশেষ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত শঙ্করদা এবং তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীমতী শিখাদেবী। এই দেবদম্পতি জগতের সংসারের সব আকর্ষণ ভুলে আশ্রমের সার্বিক উন্নয়নে মন, প্রাণ সব উৎসর্গ করে দিয়েছেন। এদেরই সুষ্ঠু পরিচালনায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে সুরম্য অতিথি নিবাস, সুন্দর চিকিৎসালয় তথা সীতারাম কমলা শিশু বিদ্যালয়, যার সঙ্গে ওঙ্কারনাথ মিশনের সম্পর্ক সুনিবিড়। কারণ শ্রীযুক্ত শঙ্করদাই হলেন ভুবনেশ্বর তথা ওড়িষা ওঙ্কারনাথ মিশনের কর্ণধার। আর একজন তরুণ বুদ্ধিজীবি তথা ব্যবহারজীবি শ্রীমান্ কৃষ্ণচন্দ্র দাসও ওঙ্কারনাথ মিশনের সেক্রেটারিরূপে শ্যামাশঙ্কর মঠের কার্যধারাকে বহুলাংশে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন শঙ্করদার সকল সেবাকার্যের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ।

শ্যামাশঙ্কর মঠে এদিনের 'যা যা নাম দিগে যা' অনুষ্ঠান বহু আড়ম্বরযুক্ত না হলেও নাম-গানে নাম-দানে প্রাণস্পর্শী। বারবার শ্রীনামকীর্তনে নাতিবৃহৎ দলটি লিঙ্গরাজের মন্দির, চতুঃপার্শ্বস্থ অলিগলিগুলিকে এবং শ্যামাশঙ্কর মঠকে মহামন্ত্রে পরম পবিত্র ধ্বনিতে মধুময় করে দিচ্ছেন। এ ছাড়াও পুরীধামে 'যা যা নাম দিগে যা' মহোৎসবে যাঁরাই যোগদান করতে যাচ্ছেন, তাঁদের অনেকেই ভুবনেশ্বর মঠও আগ্রহে পরিদর্শন করতে আসছেন। অনেকেই রাত্রিবাস করছেন তথা প্রসাদ গ্রহণও করছেন, মঠাধ্যক্ষ শঙ্করদা এবং শিখাদিদি তাঁদের যথাযোগ্য আতিথেয়তায় নিয়ত রয়েছেন। এইদিনকার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান অবশ্যই শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাকুঞ্জে জগন্নাথ দর্শন প্রসঙ্গে তথা প্রত্যাদেশ প্রসঙ্গে ধর্মসভা। ধর্মসভা সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করলেন ডাঃ প্রভাকর মিশ্র, উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন মঠাধ্যক্ষ শঙ্করদা, সর্বোপরি নামে-গানে তথা ঠাকুরকথায় অবলীলায় ঘণ্টাধিক সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন সভার মূল আকর্ষণ সর্বাধীশজী।

আর একটি অনুষ্ঠান উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে। কারণ এই ধরনের অনুষ্ঠান কদাচিৎ অন্যত্র হ'য়ে থাকে। বিশিষ্ট সীতারাম সেবক সেবিকা যাঁরা শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম প্রচারে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন মঠাধ্যক্ষ মহাশয় তাঁদের বস্ত্রাদি দিয়ে উপযুক্ত সম্বর্ধনা জানালেন। সর্বাধীশজীও তাঁর উত্তম সাংগঠনিক বুদ্ধির একটা অতি প্রশংসনীয় ছাপ রেখে গেলেন---এই দেবদম্পতিকে এবং তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণভাইকে বস্ত্রাদি দিয়ে যথাযোগ্য সম্বর্ধনা করে। সভার অন্তিমে সর্বাধীশজী মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন—বহুকাল যাবৎ উড়িষ্যায় নামপ্রচার ধারা ক্ষীণ হ'য়ে যাচ্ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণীপ্রচারেও কেমন যেন একটা শৈথিল্য এসে যাচ্ছিল। শ্রদ্ধেয় শঙ্করদাদা এবং শিখাদিদি নামপ্রচার এবং 'সুভদ্রা' পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী-প্রচারের দ্বারা একটি নূতন ধর্ম প্রবর্তন করছেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে পুরীধাম লীলাকুঞ্জে তথা নীলাচল আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'যা যা নাম দিগে যা'র মহোৎসব পর্ব নানা কারণে, বিশেষতঃ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত হ'তে যথা মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, হায়দ্রাবাদ, ঝাড়খণ্ড, ব্যাঙ্গালোর, ইউ-পি, বঙ্গ-কলিঙ্গ তো বটেই সর্বাধীশজীর পরিচালনায় বহু নূতন ভক্তের শুভাগমনে ও সর্বপ্রকার সহযোগিতায় চিরস্মরণীয় হ'য়ে রইল। আমরা অনুরোধ করেছি—সংঘের সহ-সর্বাধীশ এবং ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় আচার্য্যবর্য্য মনীষী তথা প্রত্যক্ষদর্শী কিঙ্কর সামানন্দজীকে তিনি যেন উপরোক্ত অনুষ্ঠানের একটি যথোপযুক্ত বিবৃতি পথের আলোয় যথাশীঘ্র প্রকাশ করেন। জয়পুর যোশীভবনে কোটার শ্রীগুরুশক্তি আশ্রমের অনুষ্ঠানের কিছু বিবরণ দিচ্ছেন কোটা আশ্রমে উপস্থিত ওঙ্কারেশ্বর ওঙ্কারমঠের অন্যতম মঠাধ্যক্ষ কিংকর শঙ্করানন্দজী (শ্রীমান্ সনৎভাই)।

কোটার যজ্ঞ ও যজ্ঞকর্তা—দুইই অবিস্মরণীয়

ক'দিন ওঙ্কারমঠ ছেড়ে রাজস্থানের কোটা শ্রীগুরুশক্তি আশ্রমে পরমানন্দে কাটিয়ে এলাম। সচরাচর ওঙ্কারেশ্বর ওঙ্কারমঠ ছেড়ে বিশেষ একটা বাইরে বেরুই না, কারণটা হলো একদিকে আশ্রমিক দায়দায়িত্ববদ্ধ অপরদিকে ওঙ্কারমঠের প্রতি দীর্ঘকালীন অন্তরের টান। কিন্তু এবার আর থাকতে পারলাম না যখন শুনলাম কোটার বিশিষ্ট গুরুভক্ত মহাসাধক, আশ্রমের প্রাণপুরুষ শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ সিং দাদা একটি বড় রকমের যজ্ঞ ক'রে শ্রীশ্রী শিবমন্দির তথা পবনপুত্র হনুমানজীর একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছেন। দেখতে পেলাম স্বচক্ষে কর্মযোগী কিংকর স্বরূপানন্দজীর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় ওঙ্কারেশ্বর থেকে শ্রীভগবান মহাদেব এবং তাঁরই অংশজ মহাবীরজীর মূর্তি কোটার উদ্দেশে যাত্রা করছে।

সর্বাধীশজীর নির্দেশ নিয়ে ২৪ এপ্রিল বিকালে বাসযোগেই যাত্রা করলাম কোটার উদ্দেশে। পরদিন সকালে পৌঁছে গিয়ে দেখি শ্রীগুরুশক্তি আশ্রমের যজ্ঞানুষ্ঠান তথা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার আয়োজন প্রায় সুসম্পন্ন।

২৪ তারিখেরই এক শুভ মুহূর্তে যজ্ঞ শুরু হয়েছে স্থানীয় বিশিষ্ট পণ্ডিতদের দ্বারা। যজমানের আসনে বিরাজ করছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় পৃথ্বীশ সিংজী দাদা। কিংকর স্বরূপানন্দ রয়েছে নানাবিধ সেবা-সহযোগিতায়। ২৬ তারিখ ১১টা নাগাদ জয়পুর থেকে এসে পৌঁছালেন অনুষ্ঠানের মুখ্য আকর্ষণ সর্বাধীশজী মহারাজ। শোনা গেল গতরাত্রে জয়পুরের প্রধান ভক্ত শ্রীযুক্ত অরবিন্দ যোশীজীর ঘরে ভারী সুন্দর ভজনসন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে নামে, গানে ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় জয়পুরেও সংঘশক্তির জয়জয়কার ক'রে এসেছেন মহারাজজী।

বহুবিশিষ্ট ব্যক্তি অল্প সময়ের নোটিসে জয়পুরে যোশীজীর প্রাসাদভবনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। যথা জয়পুর রাজার রামবাগ প্যালেসের অধিকর্তা ও রাজস্থানের সম্প্রদায় সভাপতি হরি সিংজী, রাজস্থানের শিক্ষাদপ্তরের secretary শ্রী হনুমান সিং ভাটী (IKS) প্রভৃতি।

কোটায় ২৭ তারিখটি ছিল রুদ্রযজ্ঞের পূর্ণাহুতির লগ্ন। তাই এদিন সকাল হতেই ভক্ত সমাবেশ সর্বাধিক। তাছাড়া বহুদিন পরে সর্বাধীশজী আসায় দীক্ষার্থীদের সংখ্যাও ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৫০। একইসঙ্গে শক্তি এবং ভক্তির দেশ এই রাজস্থান। ক্ষত্রিয় শক্তির যেমন প্রাচুর্য্য ঈশ্বরভক্তি এবং গুরুভক্তির তেমনি ঐশ্বর্য্য। সর্বাপেক্ষা আনন্দের বিষয় প্রায় ১ ডজন ক্ষত্রিয় বালক-বালিকা দীক্ষালাভের আশায় সকাল ৯টা হতেই মন্দিরে ভীড় লাগিয়েছে। বলাবাহুল্য এদের অনেকেরই পিতা-মাতা মহারাজজীর মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুরের দীক্ষালাভ করেছে। মোটামুটি ১০টা নাগাদ দীক্ষাকার্য্য শুরু হল। শুধু কোটায় নয়, জয়পুর, উদয়পুর প্রভৃতি জায়গা থেকেও বেশ কিছু মানুষজন দীক্ষালাভের প্রত্যাশায় ছুটে এসেছে। দীক্ষাকার্য্য শেষ হতে প্রায় ১১টা-১২টা তখনও বাবা-মার হাত ধরে ২-১জন বালক-বালিকা ছুটে আসছে দীক্ষার আশায়।

১২টা নাগাদ পূর্ণাহুতির পুণ্যলগ্ন। যজ্ঞমঞ্চের চারপাশে চার-পাঁচশো লোকের ভীড় উপচে পড়ছে। সর্বাপেক্ষা উল্লাসের বিষয় কোটার 'সর্বজনপূজিত রাজা মহামান্য বৃজরাজ সিং, রাণীমা, পুত্র, পুত্রবধূ, পৌত্রসহ সপরিবার উপস্থিত হলেন ঠিক পূর্ণাহুতির পরমলগ্নে। বেশ কিছুক্ষণ সুসজ্জিত বারান্দায় সপার্ষদ সকলের নয়নমণিরূপে বিরাজ করে যজমান পৃথ্বীশ সিং ও পণ্ডিতদের ডাকে তিনি যজ্ঞবেদীতে গিয়ে দাঁড়ালেন মধ্যমণিরূপে। বলাবাহুল্য মহারাজজী আগেই পৃথ্বীশ সিংহের পাশে করজোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন যজ্ঞ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়। যজ্ঞপর্ব যথাশীঘ্র সুসম্পন্ন হলো বরণ্য ব্যক্তিগণ ভক্তিভরে পুষ্পার্ঘ দিলেন। পণ্ডিতগণ তাঁদের যজ্ঞাবধি ফল-মিষ্টাদি অর্ঘ্য তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করে নিজেদের পবিত্র কর্তব্য সমাপন করলেন। এরপর শুরু হল প্রসাদপর্ব। বিপুল প্রসাদের আয়োজন। ভক্তগণ সুশৃঙ্খলভাবে প্রসাদ গ্রহণ করে যজ্ঞপুরুষ সীতারামের জয়ধ্বনি দিতে দিতে পরমানন্দে যে যার ঘরে প্রত্যাবর্তন করলেন।

২৭ তারিখ রাত্রে 'শ্রীগুরুশক্তি' আশ্রমে অবস্থান করে পরদিন প্রসাদান্তে ৩টা নাগাদ মহারাজজীকে সঙ্গে নিয়ে আমি উঠে বসলাম Intercity Express এ। বিদায়কালেও সর্বাধীশজীর মহারাজকীয় সম্বর্ধনা। স্বয়ং পৃথ্বীশ সিং দাদা তাঁর বিশিষ্ট আত্মীয় পরিজনসহ মহারাজজীকে ট্রেনে তুলে দিতে এলেন। অশীতিপর এই বৃদ্ধবয়সেও পৃথ্বীশ সিংজী আমাদের গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত গভীর ভক্তিতে যুক্ত করে গ্রীষ্মের তীব্র খরতাপের মধ্যে দাঁড়িয়ে থেকে যে সৌজন্য ও শ্রদ্ধা দেখালেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে রইলো তাঁর অনুষ্ঠিত যজ্ঞানুষ্ঠানের মতোই।

নিবেদক- সনৎভাই (কিংকর শঙ্করানন্দজী)

রাজধানী দিল্লীর বুকে একটি অনাড়ম্বর জন্মোৎসব

সর্বাধীশজী কিংকর বিঠ্ঠল মহারাজ এবং যুগ্ম মহাসচিব শ্রীযুক্ত সুব্রতদা (কিংকর জয়) উভয়ে পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক সুদীর্ঘকাল যাবৎ একটি ইতিহাস রচনা করেছে। উভয়ে তরুণকালে হতেই শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয়সঙ্গী সেবক। বলাবাহুল্য শ্রদ্ধেয় সুব্রতদা সাক্ষাৎ শ্রীশ্রীগুরুসেবার ক্ষেত্রে মহারাজজীর চেয়ে কিছুটা অগ্রগণ্য কারণ বহুকাল তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের একান্তপ্রিয় সচিব হিসাবে নানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ব্রতী ছিলেন। অপরপক্ষে বিঠ্ঠল মহারাজজীর প্রাণের টান ছিল সাধনায় ও স্বাধ্যায়ে। তবুও প্রাচীন ও নবীন ভক্তদল অনেকেই এই হরিহর জুড়িকে শ্রীশ্রীঠাকুরের বড় কাছাকাছি বহুবার দেখেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও পরিবেশে। শেষ সময়টিতেও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তিমলীলায় বারোতলায় শ্রীশ্রীঠাকুরের শয্যাপাশে তাঁর কাছাকাছি সময় কাটাতে ভালবাসতেন। পরবর্তীকালে সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সেবার ক্ষেত্রে এরা দুইজন শ্রীগুরুনির্দিষ্ট হয়ে নিযুক্ত হয়েছেন আমরা জানি। দুজনেই বিশেষ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই হয়তো মতের মিল সবসময় হয়নি কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের অশেষ করুণায় এঁদের মনের মিলের কোনদিন অভাব হয়নি। সর্বাধীশজী যেমন তাঁর বন্ধুবরকে 'আমার লক্ষণভাই' বলে গভীর স্নেহপাশে চির আবদ্ধ রেখেছেন, অপরদিকে সুব্রতদা জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামজীর মতোই সর্বাধীশজীকে বিশেষ সম্মান জানিয়ে চিরকালই শ্রদ্ধা-ভক্তিতে নতশির থেকেছেন।

শ্রীসুব্রতদা এই বছরের রাজধানী দিল্লীর তথা পরবর্তী সময়ের প্রোগ্রামগুলি খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে সাজিয়েছেন এবং সর্বদিক দিয়ে প্রচারের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাজীবনী ও বাণীপ্রচারে সনাতন ধর্ম প্রচারে সর্বাধীশজীর অনন্য ভূমিকাকে এইবার নানাভাবে সর্বসমক্ষে আনবার জন্য কিংকর জয় এই যে পরিশ্রম স্বীকার করেছেন, যে ধর্মবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন— তার জন্য তাঁকে আমরা সহস্র অভিনন্দন ও প্রণিপাত জানাই।

পূজনীয় সুব্রতদা অধিকাংশ অনুষ্ঠানগুলিরই যথাযোগ্য বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু সেই বিষয়ে সঙ্গতকারণে তাঁর নিজের অবদান বিষয়ে নীরব থেকে গিয়েছেন। তাই এই সুযোগে তাঁর সম্বন্ধে দু-চার কথা না ব'লে থাকতে পারলাম না।

এই প্রসঙ্গে দিল্লীর বুকে একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়েছেন সর্বজনপ্রিয় সুব্রতদা। সেটি উল্লেখ করার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। ব্যাপারটি হলো পূজ্য সর্বাধীশজী কিংকর বিঠ্ঠল মহারাজ এই ২০১৪ সালে ২৫শে মার্চ ৭০ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন। প্রায় ১০ বৎসর ধরে নানা স্থানে তাঁর অনুরাগীরা বহুবার চেষ্টা করেছেন তাঁর জন্মতিথি পালন করার জন্য। মহারাজজী বরাবরই সবিনয়ে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। বড়জোর তিনি বলেছেন—যদি কোনভাবে ঐ দিনটিকে স্মরণ করতে চাও তাহলে ঐদিন ঠাকুরের কোন বই প্রকাশ কর বা প্রচার কর—সেইটিই হবে শ্রেষ্ঠ সম্বর্ধনা যা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য। তাঁর এই নির্দেশকে অনুসরণ করে ২০১২ সালে 'নব নব রূপে এসো' গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদ 'চিত্তকা নিত্য মহোৎসব' ওঙ্কারমঠে মহাসমারোহে প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশের গুরুভাইরা প্রকাশ করেন। মহারাজজীর জন্মদিনের কথা কেউ মুখে আনতে সাহস পায়নি। এইবার যদিও ২৫শে মার্চ কিছু ভক্ত এসে গিয়েছিলেন মহারাজজীর নিবারণ সত্ত্বেও তিনি কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতি তাঁর দুর্লভ আনুগত্য বজায় রেখে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই পাদুকাকে পূজা করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

কিন্তু এইবার জীবনে প্রথম বোধহয় ছন্দপতনের সম্ভাবনা দেখা দিল মহারাজজীর প্রাণ-প্রিয় বন্ধুবর সুব্রতদার দিল্লীতে গূঢ় অভিসন্ধির ফলে। সুব্রতদা স্থির করেছেন, প্রায় কাউকে না জানিয়েই, তাঁর বাড়ীর লোকেদের নিয়েই মহারাজজীর ৭০ বছরের পদার্পণ উপলক্ষ্যে একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান করবেন যা হবে একান্তই ঘরোয়া, প্রাণপূর্ণ অথচ আতিশয্যবর্জিত। নিরুপায় মহারাজজী সুব্রতদার এই প্রেমের ফাঁদে ধরা দিলেন। বিগত ১৯শে এপ্রিল সুব্রতদা মহারাজজীর অস্থায়ী বাসগৃহটিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের নানা ঐতিহাসিক দুর্লভ চিত্রে সুসজ্জিত করলেন। তারপর শুরু হল নিষ্ঠাভরে শ্রীশ্রীঠাকুরের আরতি। মাতৃমন্দিরের সকল আত্মীয়স্বজন, গৃহবধূ সাবিত্রীদি হতে পুত্র, পুত্রবধূ এমনকি ছোট্ট নাতিটিও এই নীরব অনুষ্ঠানে যোগ দিলেন। নীরবে সর্বাধীশজীর দিকে এগিয়ে দিলেন জন্মদিনের প্রসাদ। একান্ত প্রিয় নাতিটি শ্রীমান সিদ্ধার্থকে নিয়ে মহারাজজী বড় নিরুপায় হয়েই সেই প্রসাদ প্রভুকে নিবেদন করলেন এবং হাস্যমুখে সকলের মধ্যে তা ভাগ করে দিলেন। জ্বলে উঠলো পবিত্র জাগ্-প্রদীপ, বহু মোমবাতী, বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ, ঝড়ে পড়ল নানা রঙের ফুল, সর্বোপরি শ্রীভগবান ওঙ্কারনাথদেবের অজস্র করুণাধারা তাঁর এই হরিহর সেবকযুগল তথা মাতৃমন্দিরের সকল সদস্যদের ওপর।

এইভাবে কিংকর জয়ের কাছে মহারাজজী পরাজয় স্বীকার করলেও তাঁর জন্মোৎসব পালনের তীব্র অনীহাকে প্রভু এইভাবেই অপরাজেয় করে রাখলেন।

নিবেদক- কিংকর দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী।

নীলাচলে 'নাম দিগে যা' উৎসব ২০১৪

সূর্য তখনও ওঠেনি, আকাশে আলো আঁধারের মেলামেশা। আমরা পুরী পৌঁছলাম। রিক্সা নিয়ে স্বর্গদার হ'য়ে চটক পর্বতের নীলাচল আশ্রমের দরজায় আসতে আসতে সকাল হলেও রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের চূড়ায় তখনও সূর্যের ছোঁয়া লাগেনি। বিরাগানন্দদার সাহায্যে আশ্রম সেবক বেণুভাই-এর সঙ্গে যোগাযোগ হল, আমাদের থাকার জন্য ঘর নির্দিষ্ট হয়েছিল 'শ্রীগুরুধাম'এ। নির্দিষ্ট কক্ষের পথে পা বাড়াতেই একমুখ হাসিসহ বিঠ্ঠল মহারাজের মুখোমুখি। তিনি তখন গরুড়স্তম্ভ থেকে আশ্রমের সিংহদ্বার পর্যন্ত প্রাতর্ভ্রমণ করছেন। প্রাথমিক কুশল ও অভিবাদন জানালেন। আমরা প্রণাম জানালাম। সকালের নিত্যকর্ম সেরে আশ্রমে আসতে না আসতেই শ্রীমৎ বিঠ্ঠল মহারাজজী বললেন, চল্, আমাদের একটু জরুরী কাজ আছে। বিরাগানন্দজী, সেনশর্মাজী, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়দাদা প্রমুখ আরও কয়েকজনের সঙ্গে প্রথমে আসা হল 'সরোজিনী মঠে' তারপর 'লীলাকুঞ্জ'। কিছু অতি প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিলেন সর্বাধীশ মহারাজজী। সকল আশ্রমবাসীদের সমস্যা শুনলেন আলাদা আলাদা করে, সমাধানও করলেন। কারও মনে যদি কোন ব্যথা থাকে, সেই ব্যথার উপশম করলেন। মধ্যাহ্ন প্রসাদ গ্রহণের পরে বেলা একটু পড়লে আবার সঘনে এলেন 'প্রেম-কুঞ্জে'। এখানেও মহারাজজীর সপ্রেম পরিদর্শনের পরে সকালের মতো একই কথা শোনা গেল—'আপনাকে ঠাকুরের প্রতিনিধি বলে মানি। শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি'। সেই সূত্রেই সর্বত্র মিলন হল, মহারাজজী পরদিনে ১০ বৈশাখের উৎসবে সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এলেন।

এখন রাত ন'টা, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের অছি পরিষদের সভা হবে। শ্রীমৎ বিঠ্ঠল মহারাজজী তাঁর কক্ষে অপেক্ষা করছেন, একে একে সদস্যরা এসে পৌঁছালেন। শ্রদ্ধেয় গোপাল মিত্র দাদা (সম্প্রদায় সঞ্চালক) আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীগুরু মহারাজের জয়ধ্বনি করে সভা আরম্ভ হল। প্রথমেই সদ্য নির্বাচিত অছি সদস্য শ্রীমুকেশ চতুর্বেদীজীকে সকলে অভিনন্দন জানালেন। গোপালদা মুকেশজীকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে রাখলেন অনেকক্ষণ। সভার কাজ চলাকালীন কানপুর থেকে এলেন শ্রী অমল নিয়োগী। এই সভায় তাঁকেও সম্প্রদায়ের অছি পরিষদে আমন্ত্রিত সদস্যের সম্মানে ভূষিত করা হয়। গোপালদা বলেন মুকেশ তুমি কানপুরে দেখে এসো অমলদা সেখানে কি করেছেন! আর অমলদা তুমি মধ্যপ্রদেশ দেখে এসো মুকেশ সেখানে কি করেছে! খুবই সৌহার্দ পূর্ণ বাতাবরণে রাত্রি সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত সভা চলে। এরপরেও আশ্রমে 'যা যা নাম দিগে যা' উৎসবের প্রস্তুতি চলে সারারাত্রি। আজ কারও বিশ্রাম নেই।

১০ই বৈশাখ, ১৪২১, সকাল ৬টা। নীলাচল আশ্রম প্রাঙ্গন ভক্তে পরিপূর্ণ। নাম সংকীর্তনের দলগুলিকে সাজানো চলছে। গত বছরের মতোই অনেক ব্যানার, পতাকা, ফেস্টুন ইত্যাদি সহযোগে বর্ণাঢ্য নগর সংকীর্তন বেরিয়ে পড়ল শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে। ঘোষালদা, অশোকদা এসেছেন নামকারী নিয়ে, আর এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের পঞ্চাশ বছরের ছায়াসঙ্গী সেবক পূজ্য সেবানন্দজী এবং শ্রীমৎ পরাঙ্কুশ স্বামীজীর আদরের সন্তান ত্রিদণ্ডীস্বামী রামরামানুজ জীয়র মহারাজ। বাংলার নানা প্রান্ত থেকে অনেক ভক্ত এসেছেন, যেমনটা প্রতিবার আসেন। কিন্তু এবারের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বিঠ্ঠল মহারাজজীর উপস্থিতিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকেই ভক্তরা সমবেত হয়েছেন। মধ্যপ্রদেশ থেকে অনেককে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন শ্রীমুকেশ চতুর্বেদীজী। জামশেদপুর থেকে সপরিবার এসেছেন বিশিষ্ট ভক্ত ও ব্যবসায়ী শ্রী চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ওঁর নেতৃত্বেই টাটায় মহারাজজী ওঙ্কারনাথ মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন। পুণা থেকে এসেছেন শ্রীশশাঙ্ক আটলেজী, হায়দ্রাবাদ থেকে তথাগত দত্ত এবং মধ্যপ্রদেশ থেকে মিশনের সভাপতি 'পরমানন্দ মাধবম্' এর সম্পাদক শ্রীকান্ত উপাধ্যায়। যুবক সংঘ ও ওঙ্কারনাথ মিশনের সকলে এসেছেন। মহা সমারোহে নগর সংকীর্তন শেষে সর্বাধীশ বিঠ্ঠলজী দীক্ষা দান করেন; তারপর মূল মঞ্চে আরম্ভ হয় ধর্মসভা। অবশ্য এর আগেই লীলাকুঞ্জে বিশেষ পূজা, হোম, পুষ্পাঞ্জলির সূচনা হয়ে গিয়েছে।

বেলা সাড়ে এগারোটা। মঞ্চে শ্রীমৎ বিঠ্ঠল মহারাজজী, ওঙ্কারনাথ মিশনের সর্বভারতীয় সভাপতি দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী, অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায়ের অছি সদস্য সেনশর্মাজী, অছি সদস্য শ্রদ্ধেয় বিরাগানন্দজী, সম্প্রদায় সঞ্চালক অধ্যাপক ডঃ গোপাল মিত্র, শ্রীজগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং নীলাচল আশ্রম পরিচালন সমিতির সভাপতি ডঃ হরিহর হোতা প্রমুখ বিশিষ্ট জন উপস্থিত হয়েছেন। প্রথমে শ্রী গোপাল মিত্র স্বাগত ভাষণ দেন, এরপর কিঙ্কর সামানন্দকে কিছু বলার জন্য বিঠ্ঠলজী আমন্ত্রণ জানান। পরবর্তী বক্তা কিঙ্কর বিরাগানন্দজী, তিনি সৃষ্টিতত্ত্ব ও শ্রীশ্রীঠাকুরের 'যা যা নাম দিগে যা' লীলার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। এইসময় মঞ্চে উপস্থিত হন জগন্নাথ মন্দিরের পাণ্ডাজী। গোপালদা তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণকালে ডঃ হরিহর হোতা মনে করিয়ে দেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভু এই চটক পর্বত দর্শন করে গিরিগোবর্ধনের কথা স্মরণ করেছিলেন। তিনি এই স্থানে বারবার এসে বসতেন, তাঁর ভাবাবেশ হতো এখানেই। এই স্থানে শ্রীশ্রীঠাকুর আজ নীলাচল আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীমুকেশজী বলেন আজ তাঁর ওপর যে গুরুসেবার ভার অর্পণ করা হয়েছে তিনি সেই সেবা আজীবন নতশিরে করে যেতে চান। শ্রদ্ধেয় আটলেকরজীও তাঁর কিছু অতিলৌকিক অনুভবের কথা ভক্তদের সঙ্গে বিনিময় করেন। ওঁর ভাববিহ্বল ও গভীব উচ্চারণ ভক্তদের মনকে ছুঁয়ে যায়।

বলতে আরম্ভ করলেন সর্বাধীশ বিঠ্ঠল রামানুজজী মহারাজ। আজ তিনি 'ফর্মে' আছেন। বললেন—তিনি এক পিস্‌ই। তাঁর কোন বিকল্প হয় না। এর আগে শ্রীভগবানের কোন লীলাই এতো বিস্তৃত নয়, এত বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। বরং বলা যায় আগের আগের লীলায় যা বীজাকারে ছিল বা যে শিক্ষার ইঙ্গিত ছিল, এবার তারই বিস্তৃত প্রয়োগ। বিঠ্ঠলজী প্রসঙ্গক্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভু, শ্রীরামকৃষ্ণলীলার নানা দৃষ্টান্তও উপস্থাপন করে দীর্ঘ উপাদেয় ভাষণ দেন। ভক্তেরা পরিতৃপ্ত হন।

নীলাচল আশ্রম এই মুহূর্তে কানায় কানায় পূর্ণ। শ্রীনাম মণ্ডপ, রাধা-গোবিন্দ মন্দিরের চাতাল ও নাটমণ্ডপ, প্রসাদস্থলী, সভাস্থল—সর্বত্রই ভক্ত সমাগম। কয়েক হাজার ভক্তের প্রসাদের ব্যবস্থা। কিঙ্কর নামানন্দজী, বিরাগানন্দজী, করুণাময় সেনশর্মাজী প্রমুখ বিশিষ্ট সেবকগণের নিশ্ছিদ্র সেবায় এবারের উৎসব সর্বাঙ্গ সুন্দর হয়ে উঠেছে।

বিকাল চারটায় উৎসবের সুসজ্জিত মঞ্চে শুরু হয় 'সঙ্গীতাঞ্জলি'। পণ্ডিত বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গানে পরিবেশ সুরে বাঁধা হয়ে যায়, এরপর ভুবনেশ্বরের শ্রীপ্রশান্ত পাড়ী এবং বর্ধমানের পার্থকুমার সরকার 'সঙ্গীতাঞ্জলি'তে অংশগ্রহণ করেন। বাপী বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় ব্রহ্ম, অর্ণব ঘোষও দক্ষতার সঙ্গে এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলেন।

সন্ধ্যা সাড়ে ছটাযায় পুরীর 'গোতিপুয়া' নৃত্যানুষ্ঠান হয় এবং রাত্রি আটটা নাগাদ আরম্ভ হয় 'কৃষ্ণকলির খেলা' নাটক। শ্রীরামপুরের অশোক মুখোপাধ্যায়ের পুত্র নারায়ণ মুখোপাধ্যায় 'সিল্যুটে ড্রামা' সংস্থার মাধ্যমে কয়েক বছর ঠাকুরের নানালীলা বা রচনার ছায়া অবলম্বনে নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। তাঁর এবারের প্রচেষ্টাটিও প্রশংসনীয়।

সমগ্র অনুষ্ঠান সুষ্ঠু সম্পাদনার কৃতিত্ব বিশেষতঃ শ্রীমৎ বিরাগানন্দজী ও শ্রীমৎনামানন্দজী (বেণুভাই) এর বলেই আমরা অনুভব করি। যে দুটো দিন পুরীতে কাটল দেখলাম বিরাগানন্দজী উৎসবের নানা দিক যেমন তদারকি করছেন, তেমনি ট্রাস্টের সভার প্রয়োজনীয় আলোচন্য সূত্রগুলি যথাসময়ে উত্থাপন করে সমাধানে সহায়তাও করছেন। বিশ্রামের সময় প্রায় নেই। একইরকম পরিশ্রম ও নিষ্ঠা করেছি নামানন্দজীর মধ্যে, তিনি হাসিমুখে আশ্রমের নিত্য প্রয়োজনের খুঁটিনাটি দেখছেন আবার একইসঙ্গে উৎসবে সমাগত প্রতিটি গুরুভায়ের প্রসাদ, থাকা ও অন্যান্য দরকার সব ব্যবস্থা করছেন অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে। এঁরা দুজনেই সহস্র সেবার মধ্যেই কিন্তু অল্পসময় করে একবার সভামঞ্চে এসে ভাষণও প্রদান করে যান। ওঁদের কর্মকুশলতা আমাদের ভরসা যোগায়। আনন্দ দেয়।

রাত্রি সাড়ে ন'টায় প্রায় দু'হাজার ভক্ত আকণ্ঠ মহাপ্রসাদ পান। সাধুসেবাও অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে মধুরেণ সমাপয়েৎ—বুদ্ধদেব চট্টোপাধ্যায়ের ধ্রুপদী স্বরে আশ্রম প্রাঙ্গন আমোদিত—আমরা কলকাতার পথে এগিয়ে চললাম। অন্তরে শ্রীশ্রীঠাকুরের 'যা যা নাম দিগে যা' লীলার জয় জয়কার অনুরণিত হতে থাকল। শ্রীক্ষেত্রে শ্রীশ্রীগুরুদেবের নানালীলা মনের মাঝে বারবার সহজভাবে এসে আমাদের উন্মনা করে ফেলে, চোখ ঝাপসা হয়—অতীত স্পষ্ট হয়ে কাছে আসে। এই আনন্দ বড় কাঙ্ক্ষিত। এটাই প্রাপ্তি। প্রণাম।

নিজস্ব প্রতিনিধির প্রতিবেদন

বর্ষসূচী - ১৪২০

		পৃঃ
	অ	
অসতো মা সদগময়	চেতনানন্দ গিরি	৫৯
অভয় লীলা	কিঙ্কর রবি দাস	১২০
অনন্তশ্রীঠাকুর ওঙ্কারনাথদেবের ১২২তম...	কৃষ্ণা মুখার্জী১৩৯	
অবতার তত্ত্ব	চেতনানন্দ গিরি	১৯১
অনুধ্যানে ওঙ্কার পঞ্চমী	শ্রী বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়	৪৫৭
অনুভূতি—সীতারাম মহাসিন্ধু তীরে...(২য় খণ্ড)	শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	৪৯৯
	আ	
আনন্দময়ের আনন্দ-আলয়	পার্বতী ব্যানার্জী	৫৫
আগমন	কিঙ্করী উমা (মেজমা)	৭৮
আনন্দময়ী মা পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ	শ্রী মৃগাঙ্ক ভূষণ নিয়োগী	১০৩
আলোকনিধি শ্রী ওঙ্কারনাথ	শ্রী বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়	১২১
আমার বাবা সীতারাম	অজয় দাস	২০৭
আমার ঠাকুর...প্রাণারাম	কাশীনাথ মুখোপাধ্যায়	২০৮
আবার এসো	কিঙ্কর সমীরণ	৩৩৮
আরব সাগরের কোলে...মহারাজের সঙ্গে	সমীর কুমার	৪৮৬
	এ	
একদা প্রদোষে	কিঙ্কর আনন্দ গোপাল	১১২
এখানে এখানে এই বাজারে	অরিন্দম চক্রবর্তী	২৭৩
একটি স্মরণীয় দোল উৎসব	কিঙ্কর শরণানন্দ	৪১১
	ঐ	
ঐ চরণতলে	তনুশ্রী দে ১১৯	
ঐশী লীলা...কিছু কথা, কাহিনী...	ডঃ সুখেন্দু কুমার বাউর	২৪১,২৮৫
	ও	
ওঙ্কারনাথ মিশনের সম্মেলন	কিঙ্কর উমানন্দ	১৪৫
ওঙ্কারেশ্বরে শ্রীগুরুপূর্ণিমা	প্রণতী ভট্টাচার্য্য	১৬২
ওঙ্কারিত ইসলাম ঃ একটি ঐতিহাসিক...	পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী, বৈদিক অধ্যাপক	৪৩১
	ক	
কন্যাকুমারীতে রামানুজ মঠ—একটি প্রার্থনা	বিমলেন্দু সরকার	৭৩
কন্যাকুমারী রামানুজ মঠ	শ্রী নরেশচন্দ্র রায়	৩২১
কন্যাকুমারী রামানুজ সীতারাম মঠ	কিঙ্কর তাপস পোড়েল	৪১৪
কথকথার মাদকতা	অন্নপূর্ণা রায়৪৯৭	
কৃপার কণা	শ্রীমতী দুর্গা বন্দ্যোপাধ্যায়	৫২৫
	গ	
গুরুকৃপা	কিঙ্করী তৃপ্তি চক্রবর্তী	৯৯
গান্ধীদাও চলে গেলেন	কিঙ্কর সমীরণ১৫৬	
গুরুকৃপায় একটি দুর্লভ গুরুসঙ্গ	রাজেন পণ্ডা৪৩৫	
	চ	
চিন্তনে পরিপ্রশ্ন	কিঙ্করী লোপামুদ্রা দাস	১২২
চিঠি	কিঙ্কর জয়	১৯৪
চিঠি	জজ্ দা	২০৬
চরণতলে	শুক্লা গুপ্ত	২৫৩
	জ	
জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে	অন্নপূর্ণা রায়	১৬৩
জ্বলন্ত আশ্বাস	মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য্য	২৫৩
জীবন মরণ তোমার স্মরণ	তনুশ্রী দে	৪৫৮
জীবন খাতার পাতায় পাতায়	শ্রী জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়	৪৮০
জয়গুরু প্রণাম	শোভা পাইন	৫০২

ত

ত্রৈকালিক প্রার্থনা	অন্নপূর্ণা রায়	৫২
তুমি যে আমার	ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৮
তুমি কি কেবলই ছবি	অন্নপূর্ণা রায়	১৪১
তুমি যার সে...	পরিতোষ কুমার সরকার	৪২৩
তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়	কিঙ্কর সেবারাম দুর্গানন্দ	৪৪৯
তোমায় নতুন করে পেলাম	জনার্দন চক্রবর্তী	৪৫৫

দ

দ্যাখ্ কাগজখানা বাঁচাতে হবে...শ্রীশ্রীঠাকুর	কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ	১৫২
দুর্গাস্তব		২২৪
দাদুর চিঠি		৩১৭
দয়াময় হরি	কিঙ্করী তৃপ্তি চক্রবর্তী	৩৮৫
দেশি আকাশ বিদেশী ভাইরাস	বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়	১৬৪

ধ

ধর্মের সংজ্ঞা কী?	মৃগাঙ্ক ভূষণ নিয়োগী	৩৩৩

ন

নাম সীতারাম	কিঙ্কর রবি দাস	১২০
নীলাচলে নামলীলা	ডাঃ অর্ক ঘোষ	১৬৪
নাম কর, ভয় পাস্ না, সব ঠিক হয়ে যাবে	শ্রীমতী রঞ্জিতা ঘোষ	৩৬০, ৪৮৯

প

পত্রাবলী	শিশির কুমার সেনগুপ্ত	২৮
প্রণাম	সোমনাথ ব্যানার্জী	৭৮
পূর্ণদাস বাউলের পদ্মশ্রী...মিশনের শ্রদ্ধার্ঘ্য		২০৪
পরমক্ষণ	সোমনাথ ব্যানার্জী	৩৮৫
প্রার্থনা	শ্রী বন্ধন মুখার্জী	৪৫৫
প্রভু আমার	জয়দীপ চক্রবর্তী	৪৫৬
পাঠকের পত্র	সঞ্জিত ভুঞ্যা	৫৪৩
প্রেততত্ত্ব	ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ	৩২৪

ব

বন্ধন	গৌরগোপাল বসু	৮,৬৬,১১৩,১৪৯,১৯৫,২৪৬,২৮৮
বিদ্বৎ সংঘে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রসঙ্গ	শ্রী মহাদেব অধিকারী	১২
বর্ষসূচী ১৪১৯		৩১
বিচারক	ললিতা দাস (কর্মকার)	৩৪১
ব্রহ্ম	ত্রিদিব বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৫৮
বিভাসতীর্থ	শ্রী প্রদীপ দাস	৫২৮

ভ

ভদ্রেশ্বরে ওঙ্কার পঞ্চমী	ডাঃ অর্ক ঘোষ	২১
ভগবান শ্রীকৃষ্ণ	পার্বতী ব্যানার্জী	১৬০
ভব নদী পাড়ি দেব	কিঙ্করী তনুশ্রী	৩৪১

ম

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথ	কিঙ্করী যোগমায়া দেবী	৬,৫০,১১১,১৫৪,১৮৩,২২৯,২৭১,৩১৫,৩৫৮,৪৭৫,৫২১
মহামিলন মঠে ১২২তম...সীতারাম-মহাসিন্ধু তুরে	কিঙ্কর সমীরণ৭১	
মহাকুম্ভ দর্শন	শ্রী দেবপ্রসাদ মজুমদার	৯৪
মহামিলন মঠ প্রসঙ্গে কিঙ্কর রামশানন্দ-অনুলেখক	হিমাংশু রায়	১০০
মহাতীর্থ কন্যাকুমারীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বৈদিক গুরুকুল...	পণ্ডিত পার্থপ্রতীম চক্রবর্তী	১০৭
মিলন মন্দির	অপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৬
মহামিলন মঠে শ্রীশ্রী শারদীয়া দুর্গাপূজা		১৯৩
মহামিলন মঠে শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা উৎসব	কিঙ্কর সমীরণ	২০১
মাতৃগাথা	শ্রীসীতারামদাস ওঙারনাথ	২৩১
মহামিলন মঠ প্রকাশের...কিছু ভিন্ন চিন্তন	কিঙ্কর সামানন্দ	৪০৬
মেলাবেন তিনি মেলাবেন	কিঙ্কর সমীরণ	৪২৮
মহাভারতের এক অবহেলিত সজ্জন	স্বামী চেতনানন্দ গিরি	৪৪৩

মোহনা	মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য্য	৪৫৮
মহাপুণ্যতিথি দোলপূর্ণিমা	পার্বতী ব্যানার্জী	৪৭৭
মহাভিক্ষা	স্মিতা মুখার্জী	৫০২
	য	
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা	শ্রী সুরেশ চন্দ্রনাথ মজুমদার	২৩৩
যুগেযুগে মানুষের বর প্রার্থনার বৈচিত্র্য	দেবপ্রসাদ মজুমদার	৫৩০
	র	
রামায়ণের শিক্ষা	শ্রী মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	২৭৬
	ল	
লীলা স্মরণ	উমা মজুমদার	৬২,৯৭
	শ	
শ্রীশ্রীচণ্ডী	—শ্রীশ্রীঠাকুর	৪,৪৮,৯২,১৩৭,১৮১,২২৭,২৬৯,৩১৩,৩৫৬,৪৭৩,৫১৯
শ্রীগুরুদেব স্বয়ং শ্রীভগবান	শ্রী সুধীর মুখোপাধ্যায়	১৬
শ্রীশ্রীব্রজমোহন মন্দির নবনীকরণ অনুষ্ঠান	কিঙ্কর জয়ানন্দ (সুব্রত রায়চৌধুরী)	১৯
শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের ১২২তম...	কিঙ্কর সমীরণ	২৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের স্বহস্ত লিখিত ন্যাসপত্রের অংশবিশেষ		৩৪
শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমার প্রাক্‌কালে প্রার্থনা	কিঙ্কর সেবারাম দুর্গানন্দ	৬৯
শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস...কলির শেষের ইঙ্গিত?	শ্রীমতী প্রণতী ভট্টাচার্য্য	৭৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের রামনামের গাড়ী চলিতং মধুরম্‌	শ্রী শক্তিকুমার চট্টোপাধ্যায়	১৪৬
শ্রীকৃষ্ণ কথা	শ্রী দিলীপ কুমার বর্মন	১৬৫
শ্রীকৃষ্ণ চিন্তন	সোমনাথ ব্যানার্জী	১৮৫
শুভ জন্মাষ্টমী	কিঙ্করী উমা (মেজমা)	২০৯
শ্রীশ্রীঠাকুর লীলা	শ্রী হিমাংশু রায়	২৩৯
শ্রীমন্‌ মাধব স্বামীজীর আবির্ভাবোৎসব	ডাঃ অর্ক ঘোষ	৩১৮
শ্রীশ্রীগুরুদেবের লীলাপ্রসঙ্গ	কিঙ্কর তাপস পোড়েল	৩৩১
শ্রী ভাগবতী কথা	শ্রী মধুসূদন কর	৩৩৬
শ্রীভুবনেশ্বর অখণ্ড শ্রীনামাশ্রমের লীলা অভিসার	কিঙ্কর বিজয়	৩৬৮, ৪৯৩
শাস্ত্রবাণীর পরিপূরক ঃ সদ্‌গুরুবাণী	কিঙ্কর বিঠ্ঠল রামানুজ	৪০১
শ্রীসীতারামভিনবস্তুতি ষোড়শকম্‌	অরিন্দম চক্রবর্তী	৪০৫
শুভ ওঙ্কারপঞ্চমী	কিঙ্কর বনশ্রী	৫০১
শ্যামকুঞ্জ	অসীম গোস্বামী	৫০১
শ্রীনামপ্রচার...১২৩তম ওঙ্কারপঞ্চমী...মুম্বাই	কিঙ্কর দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী	৫৩৫
শ্রীশ্রীঠাকুরের ১২৩তম...মহামিলন মঠে...	শ্রী অরবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৩৯
	স	
সীতারাম কে?	শ্রী ধীরেন্দ্রনাথ গুপ্ত	২৩
সাধনা	কিঙরী উমা (মেজমা)	৭৮
সংঘ সমাচার		৭৬,১১৮,২৫১,২৯৫,৫০০
সময় নাই	শ্রী পরিতোষ কুমার সরকার	১১৫
সত্য সনাতন	মৃণালকান্তি ভট্টাচার্য্য	১২১
সম্পদ	জাগলার অভয় মিত্র	১২২
সময়ের অপেক্ষায়	আশীষ বিশ্বাস	২০৯
সুখের সন্ধানে	অপর্ণা ব্যানার্জী	২৩৭
সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ	সুধীর দত্ত	২৭২
সুসাহিত্যিক শ্রী অচিন্ত্যকুমার...সাক্ষাৎকার-শ্রী বিশ্বনাথ ঠাকুর...	সংগ্রাহক শ্রী হিমাংশ রায়	৩৭৮
সীতারাম-মহাসিন্ধু তীরে...৮৮তম জন্মতিথি	রতিকান্ত মিশ্র	৪১৬
স্মৃতিকথা	কিঙ্করী উমা (মেজমা)	৪২০
সুধার ধারায়	দেবকুমার চক্রবর্তী	৪৩৯
সাধ	শ্রীশ্রীগুরুমহারাজের...শ্রীনির্বাণ	৪৪৬
সীতারাম-মহাসিন্ধু তীরে	শ্রী জয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়	৪৫৩
সীতারাম ধ্যানে	কিঙ্করী লোপামুদ্রা দাস	৪৫৬
সব তুমি	শ্রী অরূপ কর	৫২৩
সম্পাদকের উত্তর		৫৪৬
সম্পাদকীয়		১৩৬,১৮০,২২৬,৩১২,৪০০,৪৭২,৫১৮

জয়গুরু

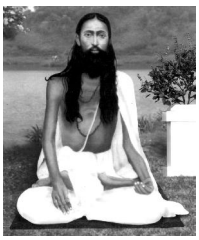

পরমগুরুদেব ঁদাশরথিদেব যোগেশ্বরের আশীর্বাণী

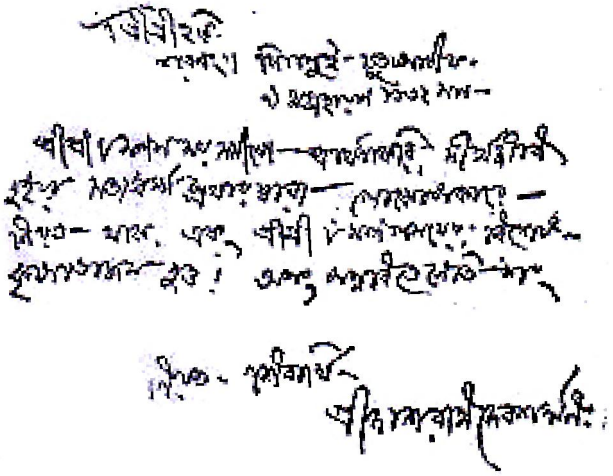

জয়গুরু

মাসিক মিলন পত্র

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥

বৈশাখ, ১৪২১ প্রথম সংখ্যা

সূচী ঃ

রঙ্গময়ের রঙ্গলীলা কথা □ হরিসাধন ভট্টাচার্য্য ৫৯৬ ● অনুভূতি □ ক্ষুদিরাম গঙ্গোপাধ্যায় ৫৯৯
● সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি □ প্রসাদচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৬০১

রঙ্গময়ের রঙ্গলীলা কথা

হরিসাধন ভট্টাচার্য্য

(১) হাস্যকৌতুক

(ক) ৫ইভাদ্র ১৩৬৬ শ্রীশ্রীঠাকুর ''নামনীড়'' থেকে পুরীর নাম যজ্ঞমণ্ডপ যাবার জন্য পুরীধামাভিমুখে যাত্রা করেন। আমরা সঙ্গী সেবকগণ বাসস্ট্যাণ্ডে ঠাকুরকে তুলে দিতে যাবার জন্য নৌকাযোগে নর্মদা পার হ'য়ে সঙ্গে যাচ্ছি। রাস্তায় যাবার সময় মেমারীর বাদলদা বললেন বাবা! যদি অনুমতি করেন আপনার শ্রীচরণসঙ্গী হয়ে যাই ও আপনার সঙ্গে জগন্নাথ দর্শনে কৃতার্থ হই।

শ্রীঠাকুর বললেন না তোর যাওয়া হবে না, তাহলে সকলেই যাবো বলবে। এখানে থেকে নামকে লক্ষ্য রাখ, সীতারাম শীঘ্রই ফিরবে। আর যদি জগন্নাথ দেখবার ইচ্ছা থাকে তো এই দেখ জগন্নাথ। এই ব'লে শ্রীশ্রীঠাকুর আমার হাসতে-হাসতে তাঁর শ্রীহস্ত দুটিকে বক্রভাবে অর্থাৎ মুড়ে ঠুঁটো সেজে জগন্নাথ রূপ দেখালেন। তখন আমরাও হাসতে হাসতে সচল বিগ্রহ জগন্নাথদেবের শ্রীচরণে দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করলাম। এইভাবে বাবা রাস্তার মাঝে আরও দু'তিনবার জগন্নাথ সেজে দর্শন দেন আর বলেন তোদের আর যেতে হবে না। যদিও তখন আমাদের প্রাণ ঠাকুর সঙ্গহীন বিরহ দুঃখে কাতর তথাপি বাবার ঐ হাসিমাখা শ্রীমুখ দর্শন ক'রে আমাদের হৃদয় ভরে গেল। তাই বলি—

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু॥

(খ) ২০শে ভাদ্র শ্রীশ্রীঠাকুর আসনে বসে আছেন। উপস্থিত শিষ্যভক্তগণ কেহ প্রণাম করছেন কেহবা নিজের প্রাণের কথা সুখ দুঃখের শান্তি অশান্তির কথা বলছেন আবার কেহ করজোড়ে অন্তরের প্রণতি নিবেদন করছেন। এমন সময় সচ্চিদানন্দ দা বাবাকে বললেন বাবা। সুজন দা (লেফ্ কর্ণেল সুজন সিং) বলছেন এখানে তিনদিন আছি—কিভাবে চলব?

রঙ্গসাগর বাবা মন্দমন্দ গতিতে সুন্দর ভঙ্গিতে একপা একপা করে নিজে চলে দেখিয়ে দিলেন এইভাবে চলবে।

উপস্থিত সকলের হাস্য, আর রঙ্গময়ও মুচকি মুচকি হেসে সে হাস্যে যোগ দিলেন। বাবার হাসির ভঙ্গিমা দেখেই আমাদের হাস্যধ্বনি বৃদ্ধি হল বাবাও আবার তাঁর শ্রীমুখকে নিজের হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে হাসতে থাকেন—আবার বললেন এই রকম চলবে।

(গ) ২১শে ভাদ্র আজ সকালে শান্তিনিকেতন থেকে মুকুলদা ও তাঁর স্ত্রী এসেছেন। আজই বিকেলে মুকুলদা বোম্বাই যাবেন সেখান থেকে বিলাতে (আমেরিকা) যেখানে থাকেন সেখানে যাবেন। তাই বাবার হাতে একজোড়া নূতন করতাল দিয়ে বললেন বাবা! এই করতালটি প্রসাদী ক'রে দিন বিলাতে খুব নামপ্রচার করবো।

রঙ্গপ্রিয় ঠাকুর আমার সেই করতালটিকে মুখের মধ্যে দিয়ে কামড়াতে লাগলেন। ইঙ্গিতে বললেন বড্ড শক্ত। তারপর হাসতে হাসতে আবার বললেন শক্ত জিনিস ভাল প্রসাদী করা যাচ্ছে না ব'লে করতালটিকে চুসতে থাকেন। উপস্থিত সকলের উচ্চহাসি।

পরে জল আনা হল বাবা নিজেই করতালটি ধুয়ে নিয়ে বাজিয়ে বাজিয়ে গান করতে লাগলেন। সেরকম বাজাবার ভঙ্গিমা দেখতে ও শুনতে বেশ লাগছিল। যেমন পাড়াগাঁয়ে ভিখারীরা করতাল বাজিয়ে ভিক্ষা করেন ঠিক সেইরকম। বাবা বাজিয়ে গান করতে লাগলেন—

''নন্দ রাখিল নাম শ্রীনন্দ নন্দন।
যশোমতী নাম রাখে যাদু বাছাধন॥

অনন্ত রাখিল নাম অন্ত না পাইয়া।
কৃষ্ণ নাম রাখে গর্গ ধ্যানেতে জানিয়া।।

''দুটি ভিক্ষে পাই মা।'' সকলের উচ্চহাসি। বাবা তাঁর শ্রীমুখ কমলকে হস্তদ্বারা আচ্ছাদিত ক'রে খুব হাসতে লাগলেন।

(ঘ) নিত্যই বাবা জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে যান। মন্দিরে যাবার পথে বহু দেবদেবীর মূর্তি আছে। বাবা একটি মৃন্ময়ী মূর্তি দেখিয়ে বললেন দেখছিস মায়ের কেমন হাসিমাখা জিভ বার করা মুখখানি! একদিন বাবা ফিক্ করে হেসে ফেললেন। আমরাও বাবার হাস্যের সহিত যোগ দিয়ে হাসতে থাকি। বাবা পুনরায় মঁার মুখে জিভটি পরিয়ে দিলেন।

মন্দিরের সামনে শিববাহন বৃষরাজ। রোজ বৃষরাজের পূজা ক'রে তবে মন্দিরে শিবপূজা করতে যান। সেদিন বাবা বৃষরাজের মুখে কতকগুলি বেলপাতা গুঁজে দিয়ে পূজারীকে বললেন খাচ্ছে না যে? আমরা হাসতে থাকি পূজারী পাণ্ডা বলেন খাবে না? একটু জলও খাবে না? এই ব'লে তার মুখে ফল ও জল ধরে রইলেন পরে হাসতে হাসতে সেই জল বৃষরাজের মস্তকে ঢেলে দিয়ে ফলগুলি পূজারীর হাতে দেন। এখন বাবা ঐরকম রোজই প্রায় করেন।

মন্দিরে যাবার পথে বা ফেরার পথে বাবাকে এখানকার আবালবৃদ্ধ বণিতা সকলে বাবার শ্রীচরণ স্পর্শ ক'রে প্রণাম করেন। ছোট ছোট ছেলেরা যখন প্রণাম করে তখন বাবা হয়ত কারও শিখা ধরে আদর করে টান দেন কারও মাথার টুপিটা তাড়াতাড়ি খুলে নিয়ে নিজে মাথার জটার উপর পরেন। ছোট ছোট মেয়েদের লম্বিত বেণী ধরে টানেন ছেলেমেয়েরাও হাসে বাবাও হাসেন আর আমরাও সে হাসিতে যোগ দিয়ে বাবার কৌতুক দেখি।

(ঙ) ১৬ই ভাদ্র নর্মদার বান খুব বেড়েছে। প্রায় ২০।২৫ হাত জল উঠেছে। খেয়া পার বন্ধ সেজন্য ডাকও অর্থাৎ চিঠিপত্র আসেনি। বাবা সচ্চিৎদাকে বললেন সচ্চিদানন্দ! আজ তোর চিঠিপত্র কি এসেছে? না—বাবা—উত্তর দিলেন তিনি। বাবা বললেন ভালই হয়েছে এখন দিনকতক বান থাক যে পত্রের পাহাড় আছে সেগুলিকে আগে উদ্ধার করি তারপর আবার দেখা যাবে। তারপর পিয়ন চিঠির গাদা নিয়ে আসে বাবা তাকে দেখেই বললেন কি? এসেছো? কতগুলি আজ এনেছ? দেখ বাবা তুমি যখন নর্মদা পার হয়ে আসবে তখন ঐ নর্মদার জলে কিছু কিছু ফেলে দিয়ে আসবে। সকলের হাসি বাবাও হাসতে থাকেন।

(২) কথা প্রসঙ্গ

(ক) কথায় কথায় একদিন বাবা বললেন বেটারা সীতারামের আদর্শকে বিকৃত ক'রে ফেলছে। যেমন ''দেবযানে'' বা সীতারামের প্রবর্তিত যে কোন মাসিক পত্রে যদি তারা সীতারামের স্তব স্তুতি দেয় বা করে তা হ'লে আদর্শ নষ্ট হয়। তা যদি তোদের ইচ্ছা হয় দিতে তা হ'লে সীতারামের প্রবর্তিত ব'লে নাম আছে সেই নামটা কেটে দে।

দেখনা মাদার পত্রিকাতে সীতারামের ছবি দেয় এটা কি ভাল? এতে আদর্শ ক্ষুণ্ণ হয়।

(খ) ২৫শে ভাদ্র ১৩৬৬ দুপুরে মধ্যাহ্ন প্রার্থনা করাবার পর বাবা বললেন দেখ এই যে জোড়হাত ক'রে প্রার্থনা করা হয় এরও বিজ্ঞান আছে। হাত জোড় করলে মনস্থিরের সহায় হয়। হাতজোড় ক'রে থাকলে আপনাআপনি প্রাণায়াম হ'য়ে যায়। স্থির হ'য়ে চুপচাপ যদি শুধু হাতজোড় ক'রে থাকা যায় তাতেও কাজ হয়।

আর এই যে ঊর্দ্ধবাহু হ'য়ে যখন কীর্তন করা হয় বা কীর্তন সময়ে হাত তুলে নৃত্য করা হয় তখন শ্রীভগবান ঐ ঊর্দ্ধবাহুদ্বয়কে আকর্ষণ করেন, অর্থাৎ ঊর্দ্ধবাহুকে ধ'রে টেনে নেন।

(গ) ২৬শে দার্জিলিং-এর শ্রীরামপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে হঠাৎ বাবা বলেন তুই কতদুর পড়েছিস? এম্-এ, নাকি?

রামপ্রসাদ দা বললেন এম্-এস্-সি।

বাবা বললেন তবে মাদারে লেখা দিস্নি কেন?

রামপ্রসাদ দা নীরব।

একটু পরেই বাবা বললেন—'তোদের জন্যই তো

মাদার। মাদারে লেখা দে প্রচার কর। কিছু না লিখতে পারলেও ভক্তচরিতকে অবলম্বন ক'রে লিখবি। রোজ যদি ৪ বা ৬ ছত্র ক'রে লিখিস তাহলে মাসে একটা বড় প্রবন্ধ হবে। এই ব'লে বাবা আদর ক'রে তাঁর মাথায় একটা থাবড়া মেরে বললেন ''যা বেটা যা মাদারে লিখবি।' ঐদিন তখনই রামপ্রসাদদা দার্জিলিং যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন বাবার স্নেহে ও কৃপায় অভিষিক্ত হ'য়ে সাশ্রুনয়নে নৌকায় উঠলেন।

(ঘ) ২৮শে ভাদ্র সন্ধ্যা প্রার্থনা মৌনান্তে বাবা প্রণাম নেবার জন্য আসন গ্রহণ ক'রে বললেন সকলে শোন বাবারা মায়েরা—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামক্রোধস্তথালোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ংত্যজেৎ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার, খোলা দরজা। এই তিনটিই আত্মনাশকারী। একথা আজ বহুবৎসর ধ'রে উচ্চকণ্ঠে চেঁচিয়ে বল্‌ছি। আজও বলছি সীতারামের বাবারা মায়েরা যখন তোদের ক্রোধ জাগবে সেই ক্রোধকে দমনের জন্য এক বেলা উপবাস ১০ হাজার ইষ্টমন্ত্র জপ করবি। সীতারামেরও যদি কোনদিন ক্রোধ হয় তা হ'লে সীতারাম সে বেলা উপবাস ও তিনঘণ্টা আসনস্থ থাকবে।

কামনা প্রতিহত হ'লে ক্রোধে পরিণত হয়। কামনা যেমন (আমি সামান্যই বল্‌ছি) আজ আমার জন্য একটা আলু ভাতে দিবে যদি আলু ভাতে না দেওয়া হয় তখনই তার কামনা বাধাপ্রাপ্ত হ'য়ে ক্রোধের উৎপত্তি হল। কি আমার জন্য সামান্য একটা আলু ভাতেও জুটল না এই ব'লে সে ক্রোধের বশবর্তী হ'য়ে গেল। তাই বল্‌ছি যে কণ্ঠ যখন স্বাভাবিক মাত্রার উপরে যাবে সে বেলা উপবাস ও হাজার জপ করবে এইভাবে নিজে নিজে ক্রোধকে দমন করতে চেষ্টা করলে ক্রোধ আর থাকবে না।

হাঁ পুত্র কন্যাদের হয়ত শাসন করতে হবে তখন তাদের প্রতি যে শাসন সে শাসন যেন ক্রোধের সহিত না হয়। অন্তরে শান্ত হ'য়ে উপ্‌রে তাদের শাসন করতে হবে। ''এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রাখা'' এইপ্রকার শাসন করবে। আর তা না ক'রে হয়ত বল্‌লে যে আজ তোকে কেটে ফেলব বা হাড় গুঁড়িয়ে ফেলব, ব'লে শাসন ক'রে, কেটে ফেলা হাড়গুঁড়িয়ে ফেলা হলনা পুত্র কন্যাদের মিথ্যা কথা শেখান হল। হয়ত কারও স্ত্রী অবাধ্যা; তাই ব'লে স্ত্রীকে প্রহার কর্‌বে না—তার হাতে জল খাবে না, কথা বল্‌বে না, তার হাতের অন্নাদি গ্রহণ করবে না, এইপ্রকার শাসন করবে। এইভাবে যদি সকলেই চেষ্টা করে দেখবে ক্রোধ জয় হ'য়ে যাবে।

বাবার শরীর সুস্থ। আনন্দময় আনন্দের হাট বসিয়েছেন। সে হাটে আসন গ্রহণেচ্ছু ভাই ও মায়েরা এসে বিনামূল্যে আনন্দ সংগ্রহ ক'রে নিয়ে যাচ্ছেন। উত্তরে ওঙ্কার পাহাড়, দক্ষিণে শিব দুহিতা মাতা নর্মদা পূর্বে ওঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ পশ্চিমে কাবেরী সঙ্গম। মধ্যস্থলে শ্রীনাম পরমানন্দে নৃত্য করছেন। দলে দলে দাদারা মায়েরা নামানন্দে এবং শ্রীগুরু সঙ্গের পরমানন্দ লাভে কৃতার্থ মনে করছেন। আনন্দ—আনন্দ—শুধু আনন্দ।

অনুভূতি

ক্ষু দি রা ম গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

বয়স অল্প—দেহের বয়স নয়, নবজীবনের বয়স। সেই জন্য খুবই আকাঙ্ক্ষা হয় শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শনের। শিশু কেবলই বাপ মায়ের সান্নিধ্য চায়। সুতরাং এ আর বিচিত্র কথা কি! কিন্তু এ বাপ মা আমার তো একার নয়। আরও কত হাজার হাজার ভাই ভগিনী রয়েছেন—তাঁহাদেরও। সকলেই তাঁহার সান্নিধ্য চায়। কত দূর দূরান্তরে ভাইরা ভগিনীরা ছড়িয়ে আছেন। সকলেরই কি আশা মিটতে পারে? মাঝে মাঝে অনেকের আশা মিটে। আমার ভাগ্যে কিন্তু এখনও তাও হয় নাই। না-ই বা হলো—ক্ষণিকের চোখের দেখা দেখে আমার লাভ কি? যদি সর্বদা মুখমণ্ডলস্থিত চোখে দেখার সুযোগ পেতাম সে আলাদা কথা। কিন্তু সে তো হবার উপায় নাই। তা হ'লে উপায় কি?

মনের ভিতর যে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ ঠাকুর গেঁথে দিয়েছেন। সাপের চোখের মত সে চোখের পল্লব নাই—অক্ষিপল্লব দ্বারা তা যে বন্ধ করে দেব তার উপায় নাই। সর্বদাই চেয়ে আছে—সর্বদাই জেগে আছে। সেই চোখ দুটোর উপর ওই কার প্রতিমূর্তি সর্বদাই প্রতিফলিত হয়ে রয়েছে—কার ফটো যেন সেখানে উঠে গেছে। অন্য জিনিস সে চোখ দিয়ে যে দেখবো তারও কি কোনও উপায় নাই? অন্য জিনিস দেখবারই বা কি প্রয়োজন? ঐ প্রতিফলিত মূর্তি প্রাণভরে দেখে নাও—সব সময়েই—জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় সর্বক্ষণ প্রাণভরে দেখে নাও।

তবে দেহস্থিত চোখের রশ্মি একদিন নিভে যাবে—তার দ্বারা দেখার এত প্রয়াস কেন? বুঝতে পারিনা যে জ্বলজ্বলে চোখ দুটো নূতন গজিয়েছে তার রশ্মিও কোনওদিন নিভে যাবে কিনা। নিভেই যদি যাবে, জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে যে চোখ দুটো পেয়েছি তার সঙ্গে যদি এর কোনও প্রভেদ না থাকে তা হ'লে এ দেখার কি প্রয়োজন? প্রভেদ নিশ্চয়ই আছে। প্রথম এটা কখনও বন্ধ করা যায় না, দ্বিতীয় এর দ্বারা আর কিছু দেখা যায় না—ওই মূর্তি ছাড়া, তৃতীয় ইহার বিনাশ নাই। এ যেন দুই সতীনের ঝগড়া—একজন দেখবে, আর অপরে দেখবে না, তাই কি কখনও হয়? তাই অপর চোখের এত প্রয়াস।

আমি নির্বোধ। আমার এই ধ্যান—আমার এই ধারণা। আমার আনুষ্ঠানিক যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপ কিছু নাই। একটা ফুল ছুঁড়ে ঠাকুরের বাঁধানো ছবির উপর ফেলি। মনে মনে বলি নাও ঠাকুর। কখনও কখনও গোলাপ ফুল মাথায় চাপিয়ে দিই। অনেক সময় পড়ে যায়—ঠাকুর কি অসন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি কি বলছেন পায়ের উপর দে। তাই দিই পায়ের উপর দিই। সাদা ফুল মাথায় চাপাই—ঠিক থেকে যায়। ও তো পড়ে না। বুঝেছি ঠাকুর সাদা ফুল ভালবাসেন। কিন্তু রোজ সাদা ফুল পাই কোথায়? যা পাই তাই দিয়েই নিজের মনকে সন্তুষ্ট করি—আর যদি কোনদিন কিছু না পাই এমনি একটু জলের ছিটে দিয়ে দিই, একটা তুলসীপাতা মাথায় চাপিয়ে দিই। সেই তিন চোখ দুটোর মধ্যের প্রতিমূর্তি খিল খিল করে হেসে উঠেন, বুঝে নিই ঠিক হয়েছে—ঠাকুর অসন্তুষ্ট হন নাই—হতেই পারেন না।

দাক্ষিণাত্যের সেই নির্বোধ ব্রাহ্মণ আপন ধারণানুযায়ী গঙ্গাদেবীর পূজা করে যদি মোক্ষলাভ করে থাকে, তবে আমারই বা হবে না কেন? সেই নির্বোধ ব্রাহ্মণ একটা গুরুতর অপরাধ করে ফেলেছিল। তার গুরু বলেছিলেন বড়ই কঠিন অপরাধ। এর প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে যদি তুমি দ্বাদশ বৎসর গঙ্গাতীরে পর্ণকুটীর নির্মাণ করে একাহারী হয়ে মা গঙ্গার উপাসনা কর। ব্রাহ্মণ গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করল। কিছুকাল পরে দেখল গঙ্গা তাহার সম্মুখে। এখানে পর্ণকুটীর নির্মাণ করে উপাসনা করতে লাগল। চারি বৎসর অতীত হইল। তথায় আগত এক সাধু একদিন ব্রাহ্মণকে বললেন প্রায় চারি বৎসর পূর্বে আমি এই পথ দিয়া যাত্রা করেছিলাম। তখন দেখেছিলাম তুমি এখানে উপাসনা করিতেছ—আজ প্রত্যাবর্তনের সময়ও দেখি তুমি উপাসনা করিতেছ। ইহার অর্থ কি? ব্রাহ্মণ বলিল গুরুর আদেশে আমি গঙ্গাতীরে দ্বাদশবর্ষ গঙ্গার পূজা করিব। সাধু তো হাসিয়া খুন।

বলিলেন এই তোমার গঙ্গা—এ যে একটা বৃহৎ পুষ্করিণী! উত্তরাভিমুখে বহুদূর যাও তবে বিশাল নদী গঙ্গার দর্শন পাইবে। ব্রাহ্মণ কপালে করাঘাত করিয়া বলিতে লাগিল হায় হায় কি করিলাম। নির্বুদ্ধিতার জন্য চারি বৎসর মাটি করিলাম। যাহা হউক অনেকদিন উত্তরাভিমুখে চলিবার পর ব্রাহ্মণ বিশাল নদীর দর্শন পাইল। দেখিল বহু পর্ণকুটীর উভয় তীরে বিরাজমান। কত সাধু সন্ন্যাসী তীরে উপাসনা করিতেছেন। ব্রাহ্মণ আশ্বস্ত হইয়া ভাবিল যাহা হউক এইবার মা গঙ্গাকে সর্বার্থ পাইয়াছি। পর্ণকুটীর নির্মাণ করিয়া যথারীতি উপাসনা করিতে থাকিল। প্রায় সাত বৎসর অতীত হওয়ার পর একদিন তাহার সন্নিকটবর্তী এক ব্যক্তির মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া ব্রাহ্মণ সন্ত্রস্ত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহাকে বলিল ভাই আমি তো গঙ্গায়ৈ নমঃ বলে উপাসনা করি—কিন্তু তুমি নর্মদায়ৈ নমঃ কেন বলছ? সে ব্যক্তি বলিল এ তো গঙ্গা নয়—এ যে নর্মদা নদী। ব্রাহ্মণের ক্রন্দন দেখিয়া সেই ব্যক্তি বলিল ভাই উত্তরাভিমুখে অনেকদূর যাওয়ার পর তুমি গঙ্গা দেবীর দর্শন পাইবে। পথিমধ্যে লোকের নিকট তুমি অনুসন্ধান করিয়া লইও—তবে তোমার আর ভুলের কোনও সম্ভাবনা থাকিবে না। ব্রাহ্মণ এইবার মুখে কেবলই মা গঙ্গা, মা গঙ্গা উচ্চারণ করিতে করিতে উত্তরাভিমুখে চলিতে লাগিল। এগারো বৎসরের কঠিন উপাসনায় শরীর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। অতিকষ্টে পথ অতিবাহিত করে, আর যাহাকে দেখিতে পায় তাহাকেই জিজ্ঞাসা করে ভাই গঙ্গামায়ী আর কতদূরে। নিস্তেজ শরীরে এক বৎসর চলার পর এমন মনে হইতে লাগিল আর বুঝি মনোরথ সফল হইবার সম্ভাবনা নাই—কপালে গঙ্গামায়ীকে দেখারও সৌভাগ্য বুঝি আর হইল না। এই স্থানেই বোধহয় জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়া যাইবে। এক ছোট পাহাড়ের নিম্নদেশে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল এই পাহাড়ের উপর উঠিলেই গঙ্গাদেবীর দর্শন পাইবে—এই পাহাড় হইতে প্রায় দুইশত গজ দূরে গঙ্গামায়ী প্রবাহিতা। মনে অসীম উদ্যম লইয়া ব্রাহ্মণ বহুকষ্টে সেই পাহাড়ের উপর উঠিয়াই দেখিল অদূরে বিশাল গঙ্গা নদী প্রবাহিত। শতশত পর্ণকুটীর তীরে বিরাজ করিতেছে ও হাজার হাজার নরনারী পুণ্যসলিলে অবগাহন ও পূজা করিতেছে। তাহার মনপ্রাণ পরিতৃপ্তিতে ভরিয়া গেল। কিন্তু পাহাড় হইতে নামিবার আর তাহার সামর্থ্য নাই। সে কেবল ক্রন্দন করে আর বলিতে থাকে— মা মা মাগো আমার কপালে সে সৌভাগ্য আর হলো না। তোমার তীরে পূজা করা তো দূরে থাক—মাগো তোমাকে একবার স্পর্শ করারও সৌভাগ্য আর বুঝি হয় না। গঙ্গার দিকে তৃষিত নয়নে চাহিয়া সে কেবলি ক্রন্দন করিতে থাকে। ক্রমশঃ তাহার শরীর নিস্তেজ হইতে লাগিল ও অবশেষে তদবস্থায় তাহার জীবনদীপ নির্বাপিত হইয়া গেল।

যমরাজ চিত্রগুপ্তকে ডাকিয়া হিসাবের খাতা পরীক্ষা করিতে বলিলেন। চিত্রগুপ্ত বলিলেন মহারাজ এই ব্যক্তি এক গুরুতর অপরাধে অপরাধী। যমরাজ তাহার আত্মার চির নরকবাসের আদেশ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন এমন সময় চিত্রগুপ্ত বলিলেন কিন্তু মহারাজ দেখিতেছি এই ব্যক্তি দ্বাদশ বৎসর গঙ্গাতীরে উপাসনা করিয়াছে। মৃত ব্যক্তির আত্মা বাধা দিয়া বলিল—চারি বৎসর পুকুরের ধারে ও সাত বৎসর নর্মদার ধারে উপাসনা করিয়াছি। গঙ্গাতীরে গঙ্গাদেবীর উপাসনা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সমস্ত শুনিয়া যমরাজ বলিলেন ওই তোমার গঙ্গাতীরে গঙ্গার উপাসনা হইয়াছে—পুকুর ও নর্মদাকে তুমি গঙ্গা বলিয়াই জানিতে —সেই তোমার গঙ্গা। অতএব তোমার অক্ষয় স্বর্গবাস।

এ যদি সম্ভব হয় তা হলে আমার পক্ষেও তেমনি ফল হবে না কেন? আমি যেভাবে আপনার উপাসনা করি, আমি যেভাবে আপনার অর্চনা করি আমি জানি তাই পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত। অপরের চক্ষে তাহার অনেক গলদ আছে— কিন্তু আমার চক্ষে তো নাই। আমি ২১৬০০ বার জপ পারি না—আমি অনেক কর্ম পারি, তবু আমি মনে করি ওই আমার ২১৬০০ বার হয়েছে।

সেই জ্বলজ্বলে চোখ দুটোর মধ্যে ঠাকুর খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বলছেন সেই ব্রাহ্মণ পুরো নির্বোধ ছিল—কিন্তু তুই সেয়ানা নির্বোধ। কেবল ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছিস।

কিন্তু প্রভো আপনি তো জানেন আপনার কঠিন আদেশ পালন করবার আমার সামর্থ্য নাই। পুরোপুরি পালন না করেও আমি তো আপনাকে সর্বদা দেখছি। এর মধ্যে তো এতটুকু অতিরঞ্জন নাই। সামর্থ্য দিন—নতুবা যা আছে তার মধ্যেই ব্যবস্থা করুন। আমার ফল কেন হবে না?

সঙ্গের ছিন্ন স্মৃতি

প্র সা দ চ ন্দ্র মু খো পা ধ্যা য়

১৩ই শ্রাবণ ৬৬ ঃ আজ প্রত্যুষে বাবা প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া ভস্ম ও তিলক ধারণ করিলেন। আজ প্রাতেই বিমলদাকে কিঙ্কর রমানন্দের সঙ্গে চিকিৎসার জন্য ইন্দোর পাঠাইলেন। বেলা দশটা পর্যন্ত মৌন থাকিয়া ওঙ্কারেশ্বর দর্শন, পূজা ও মন্দির প্রদক্ষিণ করিলেন। ইহার পর প্রার্থনা করাইয়া সকলের প্রণাম নিলেন। তাঁর সন্তানদের মুখের দিকে চাহিয়া সামান্য কিছু ফলভোগ নিবেদন করে দীক্ষার্থীদের আশা মিটাইতে গেলেন। আজ প্রায় ৮।১০জন দীক্ষার্থী ছিলেন। উহারা সকলেই গতকাল বাংলা হইতে আসিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে রেলের অফিসার ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও মুখার্জী মহাশয় অন্যতম। এরপর বাবা তাঁর সন্তানদের পত্রের উত্তর দিতে বসিলেন। বাবা পত্র লেখা কাজকে তাঁর ঠাকুরের সেবা বোধে গ্রহণ করেন। সে দিন বলেছিলেন পত্রং পুষ্প ফলং তোয়ং। অতএব সীতারাম পত্র দিয়ে পূজা করছে। বাবা বেলা দু'টার পর অন্ন ভোগ নিবেদন ক'রে পুনরায় চিঠি লইয়া বসিলেন। সান্ধ্য প্রার্থনা করাইয়া প্রণাম নিলেন। ইহার পর ওঙ্কারেশ্বরের রাজা বাহাদুর সৌভাগ সিং আসিলেন। তাঁহাকে আনন্দ দিয়া চরিতার্থ করিলেন। তিনি বাবার নিকট প্রার্থনা করিলেন ''বাবা আমাকে কিছু সেবার অধিকার দিন।'' বাবা বলিলেন ''তুমি নাম কর তবেই সীতারামের শ্রেষ্ঠ সেবা করা হবে।''

অতঃপর রাত্রি ১১টা পর্যন্ত বাবা নামমঞ্চে বসিয়া নাম শুনিতে লাগিলেন। কিন্তু যতক্ষণ তিনি নাম শুনিতে ছিলেন ততক্ষণ আগন্তুক দল তাঁহাকে বারবার প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাহাতে বাবা বলিলেন ''কাল থেকে যেন কেউ নাম শোনাকালে স্পর্শ প্রণাম না করে তার দিকে তোরা লক্ষ্য রাখবি। একটু স্থির হ'য়ে নাম শুনতেও দেয় না!''

রাত্রি ১১টার পর নামমাত্র কিছু ভোগ নিবেদনান্তে আবার পত্রের জবাব দিতে বসলেন। গতকাল রাত্রে ভোগ নিবেদনের পর বলেছিলেন ''এখন থেকে রাত ২।৩টা পর্যন্ত চিঠি লিখতে হবে।'' আর সত্যই তাই হয়েছিল, আমরা পরদিন অভিযোগ করাতে বললেন ''মৌন হ'লে কে আর লিখবে?''

দৈনন্দিন প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপনান্তে ১০টা পর্যন্ত মৌন, পরে মঞ্চে ও ঠাকুরঘরে পূজা শেষ ক'রে ওঙ্কারনাথ দর্শনে গেলেন। মন্দির হইতে ফিরিয়া প্রার্থনার পর সকলের প্রণাম নিলেন। ভোগ আরতি হইলে একাদশীর নামমাত্র ভোগ নিবেদন ক'রে উপবাসী মেয়েদের গ্রন্থপাঠ ক'রে শুনিয়ে আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে লাগিলেন।

আজ প্রাতে ৯।১০টার সময় বিমলদা ইন্দোর হইতে ফিরিয়া আসিলেন। ইন্দোরের বিচক্ষণ ডাক্তার মুখার্জী ভাল ক'রে পরীক্ষার দ্বারা জেনে বললেন এতো পাগল নয়। ওষুধ দিচ্ছি ব্যবহার করুন গিয়ে।

আজ অপরাহ্ণ ৪টার সময় সাহানাবাদ হইতে আমাদের গুরুভ্রাতা খুব যশস্বী ডাক্তার মিষ্টান্ন তাণ্ডে এসে আশ্রমের রোগীদের দেখাশুনা ক'রে ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

সন্ধ্যায় প্রার্থনার পর সকলের প্রণাম নিয়ে বাবা মঞ্চে নাম শুনিতে বসিলেন। অতঃপর কণামাত্র জলপান নিবেদন ক'রে তাঁর নৈশ কাজে বসিলেন।

১৫ই শ্রাবণ, ৬৬ ঃ আজ দৈনন্দিন প্রাতঃকালীন কৃত্যকার্যগুলি যথাযথভাবে সমাধা করিলেন; ওঙ্কারনাথ দর্শনে গেলেন। ইত্যবসরে খাণ্ডুয়ার একটি যাত্রী বাবার কৃপা পাইলেন। মন্দির হইতে ফিরিয়া আসিয়াই আজ ১১।৩০ টার মধ্যেই ভোগ আরতি শেষ করাইয়া বাবা অন্নভোগ নিবেদন করিলেন।

রেলের অফিসার শ্রীভট্টাচার্য্য ও শ্রীমুখার্জী দুজনেই আজ সপরিবারে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। করুণাময় পাণ্ডা ঠাকুরের বাড়ীতে যেখানে তাহারা ছিলেন সেখানে গিয়া তাঁহাদের বিদায় প্রণাম লইলেন।

প্রাতে ৭।৩০টা নাগাদ শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায় দাদা সস্ত্রীক অনেক ফলমূলাদি লইয়া আসিলেন।

মধ্যাহ্নে ইন্দোর হইতে কয়েকজন বিশেষ ভক্ত বাবাকে সভক্তি প্রণাম নিবেদন করিয়া গেলেন। প্রসাদ পাইবার পর ফিরিবার সময় তাহারা কয়েকখানি পুস্তক লইয়া গেলেন।

বাবা আজ খুব সকাল সকাল মৌন কুটীরের দরজা বন্ধ করিলেন। ঘরের ভিতর থেকেই তৃতীয় চক্ষুর দ্বারা সবদিকে নজরটি ঠিক রেখেছেন। মেয়েরা ১২।৩টা নাম করিতেছিলেন। ৩টার সময় তাহাদিগকে তুলিয়া দিয়া ছেলেদের বসাইয়া দিয়া গেলেন। আজ বাবা দিনের শেষ আলোটুকু পর্যন্ত চিঠি লিখিলেন।

সান্ধ্য প্রার্থনা হল রাত্রি ১০টার সময়—নাম মঞ্চে নাম শুনিলেন। নামমঞ্চ হইতে উঠিবার সময় বলিলেন কাল থেকে ত্রৈকালিক প্রার্থনার পর স্পর্শ প্রণাম লইবেন। ইহার পর আর কেহ প্রণাম করিতে পারিবে না। যথাকালে না এলে সে প্রণাম করতে পারে না—রাত্রি ১১।৩০টায় যৎসামান্য নৈশ ভোগ নিবেদন করিলেন। তারপর সকলের খাওয়া শোয়ার ব্যবস্থা করিয়া ছোট ঘরটিতে গেলেন।

১৬ই শ্রাবণ, ৬৬ ঃ দৈনন্দিন প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে প্রার্থনায় আগে ওঙ্কারেশ্বরের মন্দিরে গেলেন বৃষ্টির মধ্যে দিয়েই—কোন হেলদোল নেই। ফিরে আসবার সময় নাম নীড়ে উঠতে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন অচল অটল নড়চড় নাই। আমরা তো ভাবলাম জমাট বেঁধে গেলেন বা। প্রার্থনাদির পর জলযোগ। ইহার পর দুইজন খাণ্ডুয়ার দীক্ষার্থীকে কৃপা করিলেন। মধ্যাহ্নে ভোগ আরতির সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করাইয়া সকলের প্রণাম গ্রহণ করিলেন। মঞ্চে ও ঠাকুর ঘরে পূজা সমাপন করিয়া বাবা স্বয়ং ঠাকুরদের শয়ান দিলেন। আজ বেলা ১২টার পূর্বেই অন্নভোগ নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন ''এই হল ভদ্রলোকের মত। তা, না বেলা ৪।৫টায় ভোগ। সেটা কি কাজের কথা?'' এরপর নিজেকে আবদ্ধ করিলেন।

আজ প্রাতে বাবা যখন মঞ্চে পূজা করিয়া প্রদক্ষিণ করিতেছিলেন তখন লক্ষী ঘোষের মাতা মঞ্চে ঝাড়ু দিতেছিল। তাহাকে নিষেধ করিয়া বাবা বলিলেন, ''ঠাকুর ঘরে ঝাড়ু দিতে নাই; কাপড় দিয়া পরিষ্কার করিবে।''

সান্ধ্য প্রার্থনার পর প্রণাম নিয়া পুনরায় দরজা বন্ধ করিলেন ধ্যান ধ্যান খেলার জন্য। ধ্যান যে কে, আর কেই বা করিবেন? অন্তর জানেন।

১৮ই শ্রাবণ, ৬৬ ঃ প্রত্যুষে শৌচাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ওঙ্কারেশ্বর মন্দির গমন প্রভৃতি কার্য্য-সূচিগুলি সমাধা করিয়া ছেলেদিগকে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা করাইয়া প্রণাম গ্রহণ করিলেন; ও পরে তাঁর মেয়েদেরও আলাদা প্রার্থনা করাইয়া প্রণাম গ্রহণ করিলেন। বাবার ভাব এই যে মেয়েরাও স্বাধীনভাবে প্রার্থনা করুক। যথারীতি মধ্যাহ্ন কর্ম সকল করিয়া চলিলেন।

অপরাহ্নে ২।৩০টার সময় ''মহু'' হইতে দুইজন সমর বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী সপরিবারে বাবাকে দর্শন করিতে আসিলেন। সন্ধ্যার প্রার্থনাদি যথারীতি সম্পাদন করিয়া বাবা মৌন কুটিরে গেলেন।

আজ সান্ধ্য প্রার্থনার পূর্বে তাঁহার ''আমি সাধু হবো'' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া শুনাইলেন। মর্ম এই সাধু সেজে ভোগ বাসনা ত্যাগ না করিলে বান্ত-ভোজী হয়, চাবুক খেয়ে অস্থির হতে হয়।

ক্রমশঃ